কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

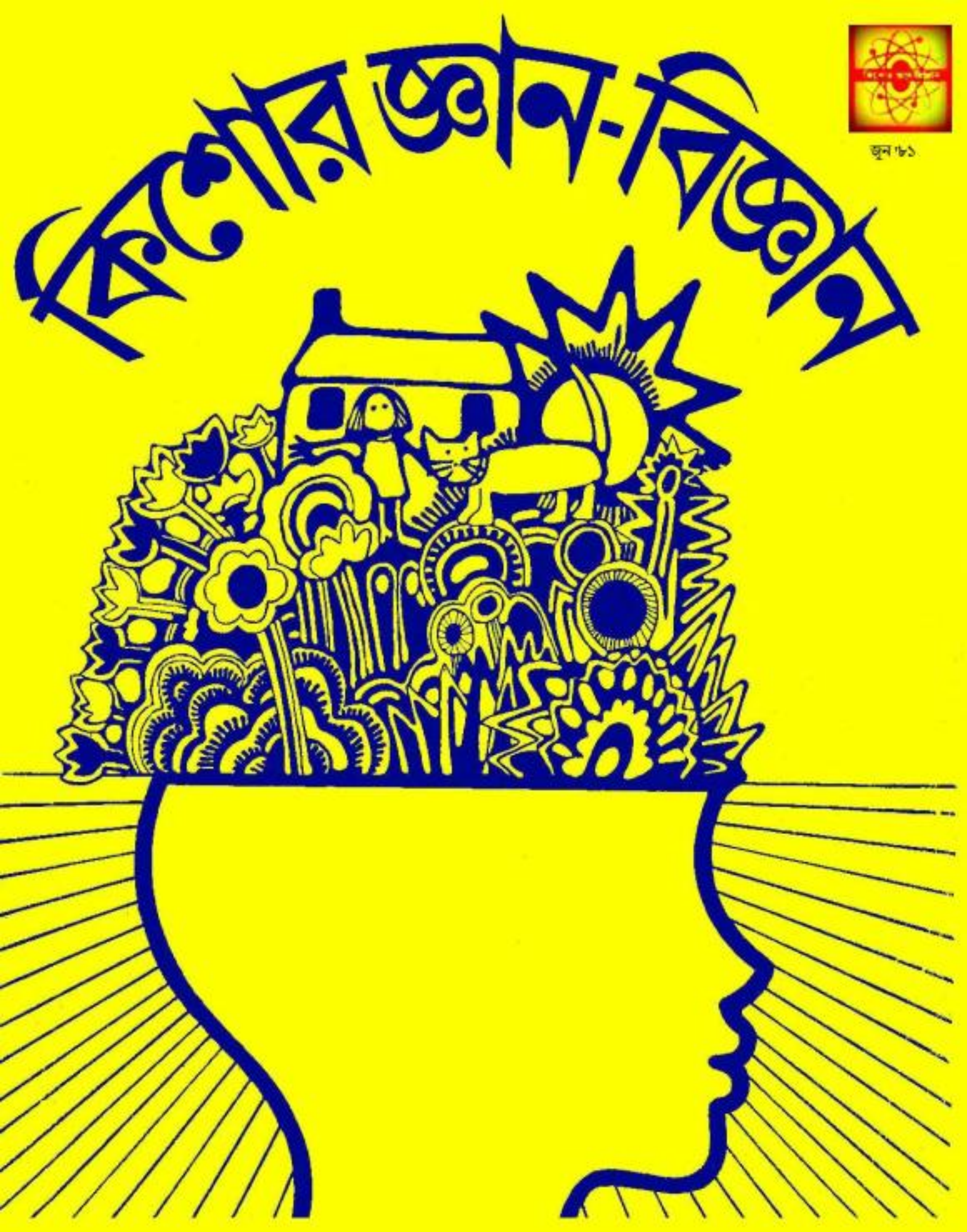

জুন '৮১

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

ভয়ংকর সেই অভিযান	১৫-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫-০০

জগদানন্দ বাজপেয়ী

বুক অব নলেজ	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫-০০

ছোটদের বই

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ, ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে। বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তাঘাটও হয়নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল।' মুখে হা-রে-রে পিলে-চমকানো ডাক। তারাই বাঙলার ডাকাত। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাঙলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। আবার সেই বই বেরুল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড	৬-০০
মহিম ডাকাত	১০-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত দস্যুকাহিনী	৬-০০

জীবনচরিতমালা

দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি।

ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২৫-০০
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ	১০-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

"কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান"-এর প্রতিশ্রুতি

'কোনো কিছুই ফাঁকি দিয়ে, বড় হওয়া যায় না। তা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সার্থক

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী অশোককুমার সরকার ও প্রধান অতিথি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ বা গল্প রচনা করার আগে লেখককে ভালো পড়াশুনো ও ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। কারণ, সাধারণ মনে বিজ্ঞান মানসিকতার উন্মেষ সাধনে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।' গত ৯শে এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটি হলে, শৈক্ষা কাশন বিভাগ আয়োজিত 'বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা' বিষয়ক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন বিদেশী শব্দের বাঙলা পরিভাষা তৈরী করে, বাঙলাভাষাকে আরো দুর্বোধ্য করা হচ্ছে, তার চেয়ে বিদেশী শব্দগুলোকে সোজাসুজি বাঙলাভাষার মধ্যে গ্রহণ করলে, তা অনেক বেশী সুন্দর, সাবলীল হবে—তা ছাড়া মাতৃভাষার শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ হবে।

এই আলোচনা সভায় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ অনাদিনাথ দাঁ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ বিজ্ঞান লেখক ও সাহিত্যিকের এক বিশাল সমাবেশ হয়। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীঅশোককুমার সরকার 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে তুলে দিয়ে শুভ সূচনা ঘটান। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপযোগী মাতৃভাষায় নানা বিজ্ঞান পত্রিকার অভাবের কথা বলেন। তিনি বলেন যে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে তিনি অত্যন্ত খুশী, এছাড়া এর সার্থক ও সুষ্ঠু রূপায়ণ তিনি বিশেষভাবেই কামনা করেন। প্রধান সম্পাদক শ্রীসমরজিৎ কর পত্রিকাটিকে চিত্তাকর্ষক, সহজ ও বোধগম্য করার জন্যে সবরকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেন। সম্পাদকীয় ভাষণে শ্রীরবীন বল এই পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্যে সমস্ত বিজ্ঞান অধ্যাপক ও সাহিত্যিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক

সম্পাদক সমরজিৎ কর অশোককুমার সরকারের হাতে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান তুলে দিচ্ছেন

অনাদিনাথ দাঁ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা বিজ্ঞান প্রসারের নবযাত্রায় সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। তিনি এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীমণি দাশগুপ্ত, শ্রীদিব্যেন্দু হোতা প্রমুখ তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

স. র.

সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখছেন রবীন বল। ডানদিক থেকে মৃণাল দাশগুপ্ত, প্রেমে[illegible] মিত্র, [illegible]কুমার [illegible]কার ও অনাদি [illegible]

অঙ্ক, ধাঁধা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বই

অরূপরতন ভট্টাচার্যের

বিজ্ঞানীর দপ্তর ৫·০০ — কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা ৫·০০
বেঠকী ধাঁধার খেলা ৬·০০ — ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা ৬·০০
পৃথিবীর বাইরে কি বুদ্ধিমান জীব আছে ৮·০০ — আমরা কেন আমাদের মতো দেখতে ৬·০০
আকাশ চেনো ১০·০০ — সংখ্যার অসংখ্য খেলা ৬·০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

করে দেখ ১ম ও ২য় প্রতি খণ্ড ৫·০০

সুধাংশু পাত্রের

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ ৮·০০ — বিজ্ঞানী চরিত কথা ১০·০০

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত — অমরনাথ রায়ের

পৃথিবী কি করে বাঁচলো ৬·০০ — বিশ্বের বিজ্ঞানী ৮·০০

দে'জ পাবলিশিং ● ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি-৭০০০৭৩

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥ জুন ১৯৮১

সূচীপত্র ঃ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি ১
সম্পাদকীয় ঃ ৩

দপ্তর থেকে

কুনেরু মহাদেশে ঃ সমরজিৎ কর ৪

উপন্যাস

শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ৯

গল্প

সবুজ দ্বীপের রহস্য ঃ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৩০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

যাযাবর পাখিরা ঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ৪৪
মরুভূমি কেন ? ঃ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫
মাটি থেকে আকাশে ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৫১
মৎস্যবৃত্তি ঃ হীরক দাশ ৫৮

পড়াশোনা

রসায়নের সহজ পাঠ ঃ অমরনাথ রায় ১৮
শতকরার সহজ নিয়ম ঃ অরূপরতন ভট্টাচার্য ৩৭

আবিষ্কারের গল্প

ক্লোরেন ঃ সুনীল সরকার ২৬

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান সাধিকা লিজে মাইংনার ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষাল ৭

ছবিতে গল্প

হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ৫৬
অজানা মহাকাশে ২৮

পশুপাখির পরিচয়

বেবুন ঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৫৪

নিয়মিত বিভাগ

ধাঁধা ১৪ ॥ নিজে কর ৪৯ ॥ বিজ্ঞান বিচিত্রা ২৪
সংখ্যাতুই ৩৬ ॥ বিজ্ঞান সংবাদ ৪৭ ॥
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ২৭ ॥ বিজ্ঞানের টুকরো খবর ৪৩

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সম্পাদকীয়

অজস্র চিঠি এসেছে সম্পাদকীয় দপ্তরে। শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আর আশীর্বানী। চিঠি লিখেছেন, পাঠক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক সকলেই। সকলেরই বক্তব্য এক। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় পত্রিকার অভাব ছিল। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান সে অভাব পূরণ করলো। আমরা হয়তো সব চিঠিই ছাপতে পারব না। তবে এর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কিছু কিছু নির্বাচিত চিঠি প্রকাশ করব।

ছোটরা অনেকে দাবী জানিয়েছে, তাদের লেখার সুযোগ কোথায় ? একটি সম্পূর্ণ ছোটদের বিভাগ থাকা দরকার। যেখানে শুধু ছোটদেরই লেখা প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ ছোটদের আসর শুরু করতে হবে। দু'তিনটে আরও নতুন বিভাগ খোলার কথা লিখেছেন অনেকে। এক 'চিঠিপত্র' বিভাগ দুই 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ'।

এই বিভাগগুলি খোলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্পাদক মণ্ডলীরা এ বিষয়ে ভাবছেন। তবে সবকিছু নিয়মিতভাবে এবং সুন্দর করে শুরু করতে সময় লাগবে বৈকি !

কুমেরু মহাদেশ

সমরেন্দ্র কর

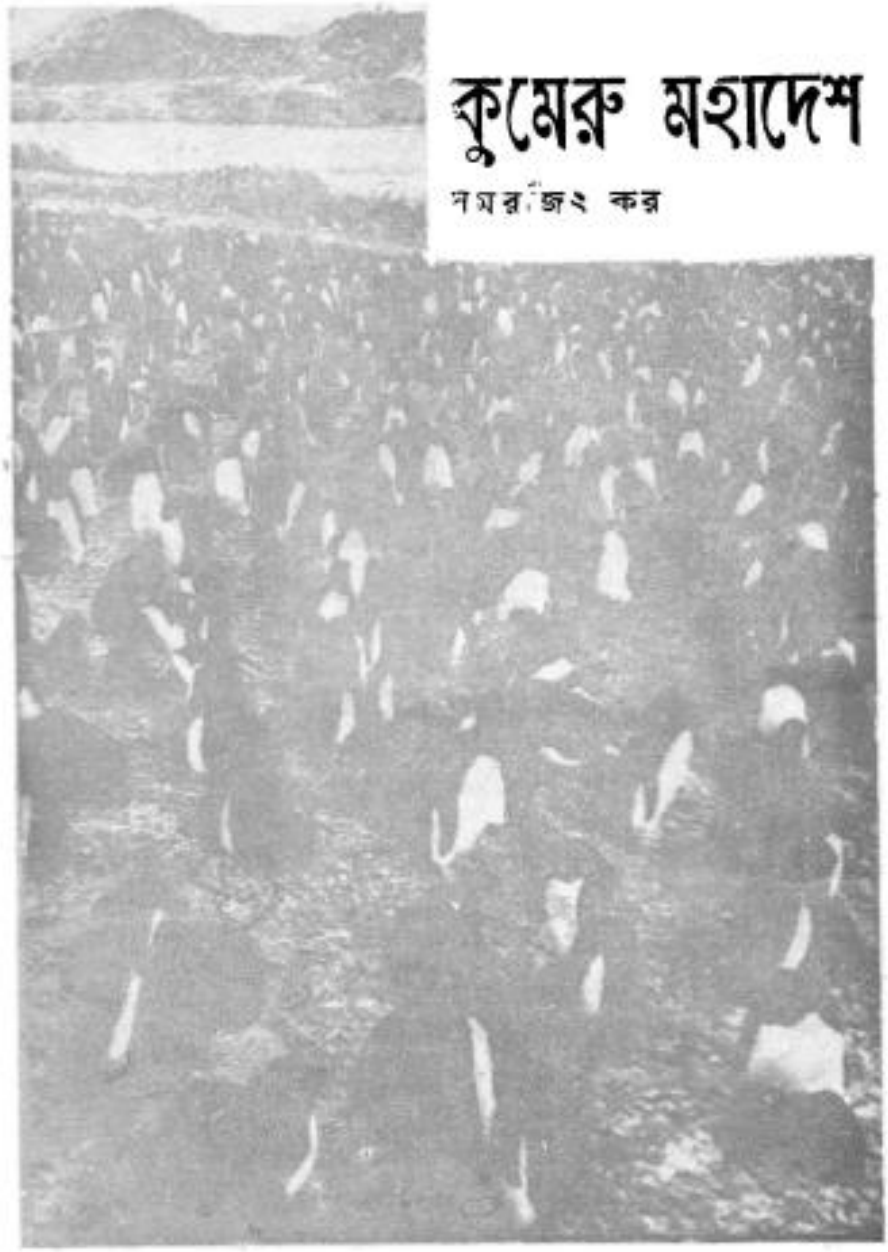

মেরু প্রদেশের বরফ গলতে সুরু করলে এদের কি বাচানো যাবে

পৃথিবী যে গোলক, এক সময় এ ধারণাটাই মানুষের ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস বললেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ যেমন আছে, দক্ষিণ গোলার্ধই বা থাকবে না কেন? থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এর আগের দুই শতাব্দীতে রোমক গণিতবিদ্ টলেমি একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন। এই মানচিত্রে তিনি গোটা আফ্রিকা মহাদেশ এবং মালয় উপদ্বীপ, এবং তাদের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এঁকে একটি সীমারেখা টানেন। তাঁর ধারণা ছিল, ভারত মহাসাগরের সীমানাই পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের শেষ প্রান্ত। তার ওপারে আর কোন কিছু থাকা সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার, টলেমির এই ধারণা পনের শতকও পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ক্রমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল। তৈরি হল উন্নত ধরনের জাহাজ। সেই জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ম্যাজেলেন আবিষ্কার করলেন ম্যাজেলেন প্রণালী। ১৫৩১ সালে আবিষ্কার হল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। স্যার জেমস্ক্লার্ক রস আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর উত্তর চৌম্বক মেরু। আর সেই আবিষ্কারের উপর গণনা চালিয়ে গণিতবিদ্ কার্ল ফ্রায়েডরিশ গাউস ঘোষণা করলেন, পৃথিবীর উত্তরে যদি চৌম্বক মেরু থাকে, তা হলে তার ঠিক বিপরীত দিকে দক্ষিণেও নিশ্চয় রয়েছে আরও একটি চৌম্বক মেরু। বললেন, এই চৌম্বক মেরুর অবস্থান ৬৬ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষ এবং ১৪৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পরস্পর যেখানে ছেদ করেছে, সেখানে। ১৮৪০ সালে ফরাসী অভিযাত্রী দুর্ম' দা উরভিল আবিষ্কার করলেন ১২০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষ এবং ১৬০ ডিগ্রি পূর্ব দাঘিমা বরাবর অঞ্চলে অবস্থান

করছে বিস্তৃত একটি ভূ-ভাগ। তাঁর কাছে মনে হয়, এটা যেন নতুন একটি মহাদেশ। আর তার কিছুদিন পরেই জানা গেল, সত্যিই সেটি একটি পৃথক মহাদেশ। যার নাম দেওয়া হয় 'অ্যানটারকটিকা' বা বাংলায় কুমেরু মহাদেশ।

অতঃপর একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযান। ১৮৭২ সালে ক্যাপটেন জেমস কুক যথাক্রমে 'রেজলিউশন' এবং 'অ্যাডভেঞ্চার' নামক জাহাজে চড়ে ঘুরে এলেন দক্ষিণ মেরুর বিরাট অঞ্চল। ১৭ জানুয়ারি, ১৯১২ সালে পৃথিবীর প্রথম অভিযাত্রী রোনাল্ড আমুন্দসেন গিয়ে দাঁড়ালেন সরাসরি দক্ষিণ মেরুর উপর। এর কয়েক দিন পর সেখানে গেলেন রবার্ট ফ্যালকন স্কট। ১৯৫৫ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল রিচার্ড ই বায়ার্ড দক্ষিণ মেরু মহাদেশের দশ লক্ষ বর্গমাইল অজানা এলাকার মানচিত্র তৈরি করলেন। এরপর ১ জুলাই, ১৯৫৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ এই এক বছর ধরে পালন করা হল 'ভূপদার্থ বৎসর'। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৬০,০০০ বিজ্ঞানী এই সময় নানা রকম গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবী সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের কাজে হাত দেন। তখন কয়েকটি দেশ উঠে পড়ে লাগে দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বা কুমেরু মহাদেশ সম্পর্কে আরও কিছু নতুন কথা জানতে। এই সব দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, ইউনিয়ন অভ সাউথ আফ্রিকা এবং ব্রিটেন। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, যানবাহন এবং সাজসরঞ্জাম নিয়ে তাদের শত শত বিজ্ঞানী এখন দক্ষিণ মেরুর রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত।

হ্যাঁ, গত কয়েক বছরে কুমেরু মহাদেশ সম্পর্কে যতটুকু খবরাখবর জানা গেছে, শুনলে অবাকই হবে তোমরা।

জানা গেছে, এই মহাদেশটির আয়তন ষাট লক্ষ বর্গমাইল। যেখানে দক্ষিণ মেরু অবস্থান করছে, সেই জায়গায় পায়ের নিচে রয়েছে প্রায় দুই মাইল পুরু বরফের স্তর। এখানকার সব কিছুতেই যেন বাড়াবাড়ি। কুমেরু পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চল। —১২৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এখানকার ঝড়ের বেগ সবচেয়ে বেশী। কুমেরু মহাদেশের অবস্থান সাগরতল থেকে গড়ে ৭০০০ ফুট উঁচুতে। পৃথিবীর আর কোন মহাদেশ এত উঁচুতে অবস্থান করে না।

তোমরা অনেকেই জান, দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব কম হলে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল বাড়ে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে কুমেরুর দূরত্ব কম। তাই দেখা যায়, নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে বস্তুর ওজন ৫০০০ টন, দক্ষিণ মেরুতে তার ওজন বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৫০২৫ টনে। পৃথিবীর পাহাড় পর্বতের চূড়া, সমভূমি, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে মোট যতটা বরফ জমে থাকে তার ৯০ থেকে ৯৫ ভাগই জমে রয়েছে কুমেরু অঞ্চলে। অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীর শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ বরফ জমেছে দক্ষিণ মেরু মহাদেশে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বরফের পুরোটা যদি গলে যায়, তাহলে সারা পৃথিবীর সাগর মহাসাগরের জলের তল প্রায় ২০০ ফুটের মত উপরে উঠে আসবে। আর তা যদি হয়, পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর এবং বন্দরগুলি তলিয়ে যাবে জলের নিচে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সারা কুমেরু মহাদেশে প্রতি বছর নতুন করে বরফ জমে ৬১২ ঘন মাইলের মত। এর মধ্যে ৩১৯ ঘন মাইলের মত বরফ জলের তোড়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে অথবা গলে যায়। বাকি ২৯৩ ঘন মাইলের মত বরফ জমে থাকে। যদি তাই হয়, প্রতি বছর সেখানে বরফের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এখানকার ঝড়ের বেগ কখনও কখনও ঘণ্টায় ১৬০ থেকে ১৮০ মাইলের মত গিয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কুমেরুর আবহাওয়া সম্পর্কে যত বেশি আমরা জানব, আমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া তত বেশি সহজ হবে।

শুধু ঝড় আর বরফই নয়। কুমেরু মহাদেশের বরফের নিচে সন্ধান মিলেছে নানা রকম খনিজ পদার্থের। অ্যানথ্রেসাইট কয়লা, সোনা, তামা, সিসে, দস্তা, ক্রোমিয়াম, টিন, মলিবডেনাম, সাদা কোয়ার্টজ পাথর, অভ্র, গ্র্যাফাইট, লোহা, প্রভৃতি। পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবাশ্ম। যা দেখে মনে হয়, এক সময় দক্ষিণ মেরুতে ছিল বড় বড় বন-জঙ্গল। অজস্র প্রাণী!

প্রায় ৪০০ রকম উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে কুমেরু মহাদেশে। ৫০ রকম কীট, ৩০ রকম পাখি। পাখিদের মধ্যে প্রধান পায়রা এবং স্কুয়া। পাওয়া গেছে অ্যাডেলি পেঙ্গুইন এবং সম্রাট পেঙ্গুইন। এই অঞ্চলের জলে রয়েছে ১৩০ রকম মাছ। হগরে, ঈল, কড প্রভৃতি। পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ চিংড়িও। আর আছে প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণী তিমি। নানা জাতের তিমি। ব্লু-তিমি, ফিন-ব্যাক, হাম্পব্যাক, স্পার্ম প্রভৃতি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয় ব্লু-তিমি। লম্বায় ১৫ ফুট। ওজন ১৫০ টন।

কুমেরু মহাদেশের প্রাণী, উদ্ভিদ্, আবহাওয়া, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে শত শত বিজ্ঞানী তাই এখন ব্যস্ততার সঙ্গে গবেষণা চালাচ্ছেন বছরের সব সময়। এই সব গবেষণায় মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবে।

বিজ্ঞান সাধিকা লিজে মাইৎনার

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

বিজ্ঞান এবং কারিগরী জগৎ—যে জগৎ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অনন্য অনুশীলতা, অপূর্ব ধীশক্তি, চিন্তার ঐকান্তিকতার সংগে সুনিপুণ কর্মকুশলতা দিয়ে ঘেরা—সেই জগতে অনুপ্রবেশ করা এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার মতো মানুষ আছে ক'জন? যদিও বা কিছু আছে, যাঁদের গবেষণার ফলে আমাদের সভ্যতা ক্রমশঃ বিকাশলাভ করে চলেছে, সেখানে এতাবৎকাল পুরুষের সংখ্যাই ছিল বেশী। বর্তমানে, এই জগতে পুরুষ-অভিযাত্রীর সংগে মহিলা অভিযাত্রিণীরাও প্রায় সমতালে এগিয়ে চলেছেন। শতবর্ষ পূর্বে এমনটি ছিল না। তখন এই জগতে পুরুষ গবেষকদের তুলনায় মহিলার সংখ্যা এত নগণ্য ছিল, যে কোন তুলনাই চলতো না। এমনি এক যুগে, এই জগতে মহিলার অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে ছিল বিস্ময়কর। সেই যুগে যে ক'জন মহিলা এই জগতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরাসী মহিলা বৈজ্ঞানিক মেরী কুরি (1867) যেমন অবিস্মরণীয়া; তেমন অবিস্মরণীয়া আরও একজন মহিলা—লিজে মাইৎনার (Lise Meitner)।

লিজে মাইৎনারের জন্ম 1878 খ্রীস্টাব্দে। জাতিতে অস্ট্রিয়ান ইহুদী। বাবা ছিলেন ভিয়েনার মানুষ—আইনজীবি। আইনের ব্যবসা ছাড়াও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের পঠন-পাঠনের ফলে পাণ্ডিত্যেও ছিলেন অসাধারণ। তাঁর ছিল বিভিন্ন-বিষয়ক গ্রন্থের অপূর্ব সংকলন, ছিল বিশাল লাইব্রেরী।

কিশোরী লিজে মাইৎনার সেই বয়স থেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁর বাবার পুস্তক-ভাণ্ডারে। সময় নেই, অসময় নেই সেই ভাণ্ডারের এক একটি রত্ন সযত্নে আহরণ করতে থাকেন নিজের মনের মণিকোঠায়। বিজ্ঞান-বিষয়ক বই পেলে তো আর কথাই নেই—দিনরাত তাঁর কাছে যেন একাকার হয়ে যেত। আহার আছে, নিদ্রা আছে, বাইরের একটা জগৎ আছে, সেই জগতেও ছড়িয়ে আছে কত অনুপম সৌন্দর্য, কত না মানুষের মিছিল সেখানে লিজে তখন যেন ভুলেই যেতেন সেই জগতের কথা।

লিজে মাইৎনারের চেয়ে এগারো বছরে বড় মেরী কুরীর প্রতিভা তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ ভূখণ্ডে।

মেরী কুরি—লিজে মাইৎনারের আদর্শ মহিলা।

প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ শেষ হোল লিজের। এবার উচ্চতর অধ্যয়ন। মনে মনে ঠিক ক'রেই রেখেছেন লিজে, বিজ্ঞানই হবে তাঁর উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয়।

তখনকার দিনে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ঠিক ক'রে নিত, তাদের গুরু কে হবেন। লিজেও ঠিক করে রেখেছিলেন, বার্লিনে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কাছে তিনি অধ্যয়ন করবেন। শুনে খুবই চিন্তায় পড়লেন বাবা। কিন্তু, মেয়ের জেদের কাছে সায় না দিয়ে পারলেন না।

বিজ্ঞান-জগতে এই জার্মান বৈজ্ঞানিক এক অবিস্মরণীয় নাম। প্রায় সারাজীবনের গবেষণালব্ধ 'আলোককণাবাদ' (কোয়ান্টাম থিওরী), যদিও বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি দিয়েছিল, তবুও, বলতে গেলে, প্রায় যৌবনকাল থেকেই তিনি গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন—চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন একজন প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক হিসাবে।

লিজের আগ্রহ, বুদ্ধিমত্তা এবং ঐকান্তিক প্রবণতা দেখে খুশীই হলেন প্ল্যাঙ্ক। মন-প্রাণ খুলে শিষ্যা লিজেকে নিয়ে চললেন বিজ্ঞানের সব রোমাঞ্চকর পথের মধ্য দিয়ে। অন্যতম বৈজ্ঞানিক অটো হান্ তখন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কাছেই গবেষণা করছেন। লিজে তাঁকে পেলেন তাঁর গবেষণা কাজের সহযোগী হিসাবে। লিজের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল—বিশেষ কতকগুলি পরমাণুর (atom), স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা। এর ফলে আবিষ্কৃত হোল এক নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ—যার নাম হোল 'প্রোটোঅ্যাকটিনিয়াম'। একে আবার ভেঙ্গে পাওয়া গেল 'অ্যাকটিনিয়াম'। অস্থির উন্মাদনায় আরও এগিয়ে চলেছেন লিজে। এবার গবেষণার জন্য বেছে নিলেন রেডিয়াম আর থোরিয়ামের দিক। এই দুটি তেজস্ক্রিয়

পদার্থকে বিকেন্দ্রীকরণ করলে কি পাওয়া যায়, তা দেখবার জন্যে। বিটা রশ্মি ও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার উপর তাঁর গবেষণা ছিল ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণা কাজেরও দিশারী। সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারিণী লিজে মাইৎনার-এর প্রতিটি গবেষণা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য।

তিরিশের দশক—বিজ্ঞান জগতের সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা তোলপাড় শুরু করেছেন ইউরেনিয়ামকে নিয়ে। বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফার্মি নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত হেনে এমন এক জিনিস দেখলেন, যা এর আগে আর কেউ দেখেছেন কি না, সন্দেহ। তিনি, এই নূতন জিনিসটির নাম দিলেন 'নেপটুনিয়াম'। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মহলে উঠলো আলোড়ন। জার্মান রসায়নবিদ ইসা নোদাক বললেন ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিচ্ছুরণকে নেপটুনিয়াম বলে ভুল করেছেন ফার্মি। মাদাম কুরীর মেয়ে জোলিও কুরীরও প্রায় এক কথা। চললো বাদ-প্রতিবাদ। কথা কাটাকাটি চললেও সব বৈজ্ঞানিকের সামনে তখন একটি মাত্র লক্ষ্য—আইনস্টাইনের সেই বিশ্ববিপ্লবকারী $E = Mc^2$ এই সূত্রের ভিতর যে প্রচণ্ড গতি লুকিয়ে আছে তাকে বের করে আনতে হবে।

আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত সূত্রের মধ্যে যে বিশ্ব-বিপ্লবকারী শক্তি রয়েছে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত লিজে মাইৎনারও তাকে খুঁজে পেতে চান,—পেতে চান হাতের মুঠোয়।

ইতিমধ্যে লিজে পেয়েছেন আরও একজন সহযোগী। নাম—স্ট্রাস্‌মান্। এই দুই সহযোগীর সহায়তায় লিজে তৈরী করলেন এমন এক সূক্ষ্ম পারমাণবিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র যাতে পরমাণুর সামান্যতম রসায়ন-বিক্রিয়াও ধরা পড়ে।

এরপর তিনি ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীন (neuclie)-এর মধ্যে ধীরগতি সম্পন্ন নিউট্রন আঘাত হেনে এমন এক পদার্থের অস্তিত্ব পেলেন যার অস্তিত্ব এর আগে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধরা পড়ে নি। লিজে এর নাম রাখলেন 'বেরিয়াম'। এইখানে এসে বাধা পেল লিজের গতি। হান্ এবং স্ট্রাসম্যানও থেমে গেলেন।

এতদিন এই সব গবেষণার কাজ তিনি ক'রে আসছিলেন জার্মানীতে ব'সেই। তখন তিনি বার্লিনের কাইজার উইল্‌হেম ইন্‌স্টিট্যুটের নিউক্লীয়ার ফিজিক্‌স্ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।

1938 সাল। দেখতে দেখতে জার্মানীর মাটি ভেদ ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে উঠলো নাৎসী সম্রাট হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুঙ্কার।

ইহুদীদের উপর জার্মানীর জাতি-শত্রুতা ছিল বরাবরই। হিটলারের তো কথাই নেই। কিন্তু সম্রাট হবার পর প্রথমদিকে হিটলার শত্রুতা সাধনের ইচ্ছা চেপেই রেখেছিলেন। কেননা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কারিগরী বিদ্যা—সব দিক থেকেই ইহুদীরা ছিল অগ্রগণ্য। দেশের স্বার্থে প্রথম দিকে তাই হিটলার তাঁদের জার্মানীতে থেকেই কাজকর্ম করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রথম কাজ হোল ইহুদী নির্মূল করা। হিটলার তাঁর দুর্ধর্ষ গেস্টাপো বাহিনী দিয়ে ধরে আনতে লাগলেন ইহুদীদের আর বিনা-বিচারে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। যত বিশ্ববিখ্যাত ইহুদী বৈজ্ঞানিক জার্মানীতে ছিলেন সকলেই কোনরকমে পালিয়ে বাঁচলেন—এমন কি আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকও।

লিজে মাইৎনারের কানেও খবর এলো—তাঁকেও ধরা হবে। গেস্টাপোরা তাঁর গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। আর নয়। কোনরকমে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন জার্মানী থেকে। সে পলায়ন ছিল ঐতিহাসিক।

লিজে এবার সোজা এসে উঠলেন স্টকহোমে। অটোফ্রিস, লিজে মাইৎনারের ভাইপো তখন কাজ করছেন বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী নীল্ বোরের সঙ্গে। লিজে এলেন ভাইপোর কাছে।

হান্ এবং স্ট্রাসম্যানের গবেষণার ফলাফল কানে এসে পৌঁছুল লিজে মাইৎনারের। শুনলেন, ২৩৮ ওজনের ইউরেনিয়ামকে আঘাত হেনে তাঁরা নাকি দুটো আইসোটোপ পেয়েছেন, যাদের আণবিক ওজন হোল যথাক্রমে প্রায় ১৪০ এবং ৯০। কিন্তু কেমন ক'রে কীভাবে যে তাঁরা পেলেন, তার সঠিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারলেন না।

লিজে মাইৎনার ঠিক করলেন, তিনি নিজেই এ ব্যাপারটা গবেষণা ক'রে দেখবেন। এখন আর হিটলার বা তাঁর গেস্টাপো বাহিনীর আতঙ্ক নেই। এখন তিনি রয়েছেন আমেরিকার নিরাপদ আশ্রয়ে। গবেষণার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধেও পেয়েছেন। মন-প্রাণ দিয়ে আবার লেগে পড়লেন গবেষণার কাজে। সফলও হলেন। যুগান্তকারী সাফল্য লাভ করলেন তিনি। দেখলেন, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের ভাঁজে আরো দুটো কেন্দ্রীন—বেরিয়াম আর ক্রাইপটন্ এসে জমলো—যাদের পারমাণবিক শক্তি প্রায় দু'লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

1905 সালে আইনস্টাইন যার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, লিজে যেন এবার তা নিজের চোখে দেখলেন প্রায় চৌত্রিশ বছর পরে। 1939 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'নেচার'-এ লিখলেন এই গবেষণার কাহিনী। লিজে এই প্রচণ্ড শক্তির নাম রাখলেন 'ফিশন'। বিজ্ঞানের শব্দভাণ্ডারে এই প্রথম 'ফিশন' শব্দের আবির্ভাব ঘটলো।

পত্রিকায় গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। হিটলারের অত্যাচারে অত্যাচারিত, নিপীড়িত বিজ্ঞান সাধকেরা যেন দেখলেন, থাম ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে দুর্ধর্ষ দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য নৃসিংহমূর্তিতে প্রচণ্ড শক্তি।

ডেনিস্ পদার্থবিদ নীল্‌স্ বোর ছুটে এলেন আমেরিকায়। ঘন ঘন আলোচনা বসলো আইনস্টাইন আর ফার্মির সঙ্গে এই শক্তি দিয়ে আগে দৈত্য হিটলারকে নিধন করতে হবে, তারপর অন্য কথা। সে আর এক ইতিহাস। বৈঠকের পর বৈঠক বসলো প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে। তৈরী হোল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'। তৈরী হোল আণবিক বোমা।

তারপর এলো সেই ঐতিহাসিক দিন। হিরোসিমা, নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মুছে গেল হিটলারের অস্তিত্ব।

আর সেই প্রথম পৃথিবীর মানুষ শুনলো বিজ্ঞান-সাধিকা লিজে মাইৎনারের নাম। রুজভেল্ট-পত্নী এলেনার 1945-এর বেতার-ভাষণে লিজেকে তুলনা করেছিলেন মেরী কুরীর সঙ্গে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের সত্যকে তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন সত্য, কিন্তু এই বিরাট ধ্বংসকাণ্ড তো তিনি চান নি। আইনস্টাইনের মতো তিনিও মুষড়ে পড়েছিলেন। আবেদন রেখেছিলেন সকলের কাছে— এই বিরাট শক্তিকে শান্তি আর সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে।

বিগত ১৭৫ বৎসরের মধ্যে মাত্র দু'জন বিদেশী মহিলা সুইডিশ আকাদেমী অব্ সায়েন্সের সদস্যা হতে পেরেছিলেন— মেরী কুরী, আর তাঁরই মানসকন্যা লিজে মাইৎনার। 1968 সনের 27 অক্টোবর লিজে মাইৎনার পরলোক গমন করেন।

গ্রাম ও পোস্ট : গুরাপ, জেলা : হুগলী

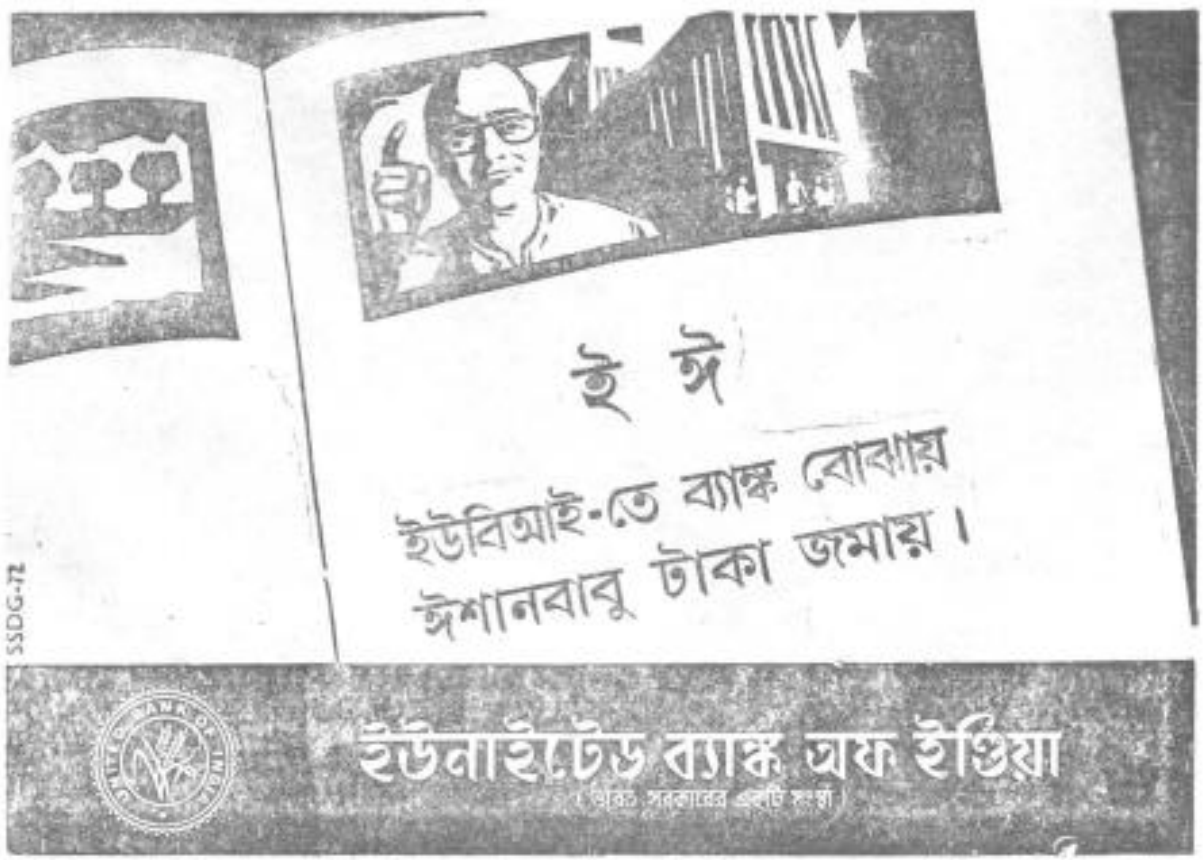

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস্

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গল গ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

[চুরি হয়ে যাওয়া একটি মূল্যবান আংটির সন্ধানে লণ্ডন শহরের একটি প্রাচীন শিল্পদ্রব্যের দোকানে এসে হাজির হলেন শার্লক হোমস্। দোকানে এসে চোরাই আংটি তো উদ্ধার করলেনই - সেই সংগে অদ্ভুত সুন্দর চকচকে একটি ক্রিস্ট্যাল হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হোমস কিনে ফেললেন পাঁচ পাউণ্ড দাম দিয়ে। ক্রিস্ট্যালটা কেনার ব্যাপারে হাডসনেরও প্রবল আগ্রহ ছিল - যার আঙুল থেকেই হোমস চোরাই আংটি উদ্ধার করেছে। হাডসনের মতো বাজে লোকের ক্রিস্ট্যালটার প্রতি লোভ কেন ? এ কথা মনে হওয়া মাত্রই হোমস বাড়ী ফিরে একাগ্রমনে ক্রিস্ট্যালটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ক্রিস্ট্যালের ভেতরে। নীল অগ্নিশিখা ঝিলমিলিয়ে উঠছে - ক্রিস্ট্যালের মধ্যে। বিচিত্র সব রঙের মেলা। কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে হালকা সবুজ রঙের মাঠের মাঝখানে লালমাটি। অধীর উত্তেজনা নিয়ে হোমস তার পরদিন হাজির হলেন, অমর বৈজ্ঞানিক প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বাড়ীতে। বললেন, অদ্ভুত প্রহেলিকা। সমস্ত পর্দা টেনে আগে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিন। এবার এটার দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করুন। —বলেই হোমস ক্রিস্ট্যালটাকে টেবিলের উপরে রেখে দিল। অবাক বিস্ময়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার লক্ষ্য করলেন, নীল দ্যুতি গলে গলে বেরোচ্ছে - ক্রিস্ট্যালটার ভেতর থেকে। সামান্য কুয়াশার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে সবুজ মাঠ। হঠাৎই কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে দেখা গেল - সঞ্চরমান মূর্তি। বিশাল বিশাল গুবরে পোকা। লম্বা শুঁড়ে চলাফেরা করছে।

—দেখেছ হোমস্ ? দেখেছ ?

'আমি সব দেখেছি। যা দেখেছি আপনাকে লিখে জানাচ্ছি। আপনিও লিখে জানান।' আশ্চর্য ! দুজনে একই জিনিস দেখেছেন। দুজনের লেখাই এক। অদ্ভুত সঞ্চরমান প্রাণী। লম্বা বাঁধ। দুজনরেই অনুমান ভিন্ন গ্রহের দৃশ্য। চ্যালেঞ্জারকে আরও অনুসন্ধানের অনুরোধ জানিয়ে হোমস বাড়ী চলে গেলেন।]

শার্লক হোমস্ রাস্তায় নেমে হাতছানি দিয়ে দাঁড় করালো একটা চলমান ছ্যাকড়া গাড়ীকে। সেই গাড়ীতে আরোহণ করে পৌঁছালো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। দু'দুটো অতি জটিল ক্রাইম-কেস নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করে জ্ঞানদান করল অফিসারদের। সেখান থেকে আপন আলয়ে ফিরে নিজস্ব মতামত লিখে রাখল অপরাধ রহস্য দুটির ওপর···ক্রিস্ট্যাল রহস্যকে নির্বাসন দিল মস্তিষ্কের সব ক'টা খুপরি থেকে। তারপর নৈশ আহারে বসল বন্ধুবর ডাক্তার ওয়াটসনের সঙ্গে। মত্ত হল বিশ্রম্ভালাপে রোজকার মত···কিন্তু ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করল না ক্রিস্ট্যাল এবং তার মধ্যে দেখা অপার্থিব দৃশ্যের।

পরের দিন সকালে ওয়াটসন রওনা হল 'রোগী দেখার

অভিযানে। হোম্‌স্‌ গেল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ক্রাইম কেস দিয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলিকে উত্তেজনা যোগাতে। ফিরে এসে দেখল, বেকার স্ট্রীটে সাদা মাটা ঘরটিতে বসে প্রফেসর এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। শুধু বসে নেই, বলতে গেলে ছটফট করছেন। আত্যন্তিক উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছেন। কখনো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছেন। ঘরময় পায়চারী করছেন। ফের এসে ধপ করে কাঠাসনে দেহভার নাস্ত করে বন্দুক নির্ঘোষের মত ভীষণ শব্দে আঙুল মটকাছেন।

শার্লক হোমসের দীর্ঘ শীর্ণদেহ কক্ষমধ্যে আবির্ভূত হতেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার প্রকাণ্ড গরিলার মত ধেয়ে এলেন তার দিকে।

বললেন রাষভ কণ্ঠে···"হোম্‌স্‌ তোমার অবর্তমানে তোমার ল্যাণ্ডলেডীর কৃপায় বসবার সুযোগ পেয়েছি ঘরে। ঘরটা যদিও বড় অগোছালো কিন্তু না এসে পারলাম না। কেন জানো ?"

"কেন ?" দৃষ্টি সূচ্যগ্র হয়ে এল হোমসের···প্রশান্ত রইল কিন্তু কণ্ঠস্বর। "ঠিকই ধরেছো তুমি···কৃস্ট্যালের মধ্যেকার দৃশ্য অন্য কোনো গ্রহের। কোন্‌ গ্রহ আমি তা বের করে ফেলেছি।"

এবার আর প্রশান্ত রইল না হোমসের কণ্ঠস্বর। উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটল যেন দ্রিমি দ্রিমি স্বরে··· "মাইডিয়ার চ্যালেঞ্জার, বলছেন কী !"

"মাইডিয়ার হোম্‌স্‌, ঐ রকমই বলি আমি। তোমার ভাষায় যাকে বলা যায়···চমকপ্রদ, অসাধারণ, অদ্ভুত। আমার গবেষণাগার থেকে প্রস্থান করার সময়ে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখে গেছিলে—কৃস্ট্যালটাকে যেন নিরন্ধ্র অন্ধকারের সুযোগে অবলোকন করা হয়। আমি তাই করেছিলাম। ফোটোগ্রাফাররা যে ধরনের পুরু কালোকাপড় দিয়ে নিজের মাথা আর ক্যামেরার আই-পীস ঢেকে ছবি তোলে, সেই ধরনের মোটাকালো কাপড় দিয়ে কৃস্ট্যাল আর নিজের মাথা ঢেকেছিলাম যাতে আলোকরশ্মি একেবারেই না প্রবেশ করতে পারে। ফলে আমি যতটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ততটা স্পষ্ট তুমি নিজেও আজ সকালে দেখতে পাও নি। আমি দেখলাম, রজনীর আবির্ভাব ঘটেছে অজানা সেই গ্রহে। তাই দেখলাম না সেই বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য—কিন্তু দেখলাম আকাশের কালো চন্দ্রাতপে মিটমিট করছে অগুন্তি নক্ষত্র। মাই ডিয়ার শার্লক হোম্‌স্‌, পিলে চমকানো আবিষ্কারটা করলাম ঠিক তখনি···একটা পরম সত্যের মণিকোঠার দ্বার নিমেষমধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল আমার মনের মণিকোঠার সামনে।"

উদগ্র উত্তেজনায় পৃষ্ঠবংশ বেঁকিয়ে হোম্‌স্‌ বললে— "কি সেই পরম সত্য মাই ডিয়ার প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ?"

মঞ্চের নায়কের মত বীরোচিত ভঙ্গিমায় প্রশস্ত বুক চিতিয়ে নাটকীয় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার··· 'ছাদের ঠিক মাথায় যেখানে রাশি রাশি তারা চোখ মিট মিট করে চেয়েছিল আঁধার পানে, তারাদের সেই দঙ্গলের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করতেই আবিষ্কার করলাম সপ্তর্ষি মণ্ডলকে. দেখলাম সাত তারাকে। বলো, কি বুঝলে ?"

"গ্রহটা পৃথিবী গ্রহ না হলেও পৃথিবীরই প্রতিবেশী কোনো গ্রহ···তাই একই তারকামণ্ডলীকে দেখা যাচ্ছে আকাশে।"

"এগজ্যাক্টলি। সাত তারার এই নক্ষত্রকে দেখতে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা খড়্গের মত। অজানা গ্রহের আকাশেও দেখলাম সেই একই ঝিকিমিকি জিজ্ঞাসা চিহ্ন। সপ্তর্ষিকে চৈত্র-বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের খুব ওপরে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণে ক্রমেই পশ্চিমে সরে আসে। শেষে ভাদ্র থেকে অঘ্রাণ মাস পর্যন্ত আকাশে দেখাই যায় না। পৌষ মাসে দেখা যায় উত্তর পূর্ব আকাশে। হোম্‌স্‌ মাসগুলোর নাম শুনে তোমার খট মট লাগছে বুঝতে পারছি···কিন্তু বাংলায় নামগুলো বললাম সপ্তর্ষি নিয়ে অদ্ভুত একটা কাহিনী মনে পরে গেল বলে। যদি পারমিট করো তো বলতে পারি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে হোম্‌স্‌ বললে···"সংক্ষেপে সারুন।"

"ভারতীয় পুরাণ পড়েছো ? পড়ো নি। অন্যায় করেছো। আমার মতে প্রতি বৈজ্ঞানিকের উচিত ভারতীয় পুরাণ কণ্ঠস্থ রাখা। তুমি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নও। কিন্তু অপরাধ বিজ্ঞানী তো বটে। আচ্ছা আচ্ছা সংক্ষেপেই সারছি এবার। পুরাণের মতে উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবর নামে হয়েছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবর মত সাতজন ঋষিও আকাশে তারা হয়ে আছেন। তাঁদের নামেই এই সাতটি তারার নাম ···বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য আর ক্রতু। সপ্তর্ষির মাথার তারা দুটোকে মনে মনে একটা লাইন দিয়ে যোগ করে সেই লাইনটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে গেলেই ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবে। সপ্তর্ষি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, এই লাইন ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবেই মাই ডিয়ার হোমস্‌, এই ভাবেই অজানা গ্রহের আকাশে খুঁজে পেলাম ধ্রুবতারাকেও। এমন কি বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী তারাকেও দেখলাম অস্পষ্ট-

ভাবে বশিষ্ঠের পাশেই। এর পরে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে যা দেখছি তা এই সৌরজগতেরই কোনো গ্রহের আকাশ।"

"হুম্!" গলার মধ্যে দিয়ে শব্দটাকে ফের বার করল হোম্স্। "হুম্।"

চ্যালেঞ্জার বললেন. একটু ভুরু কুচকেই বললেন··· "প্লীজ, আমার কথার মধ্যে ঐ রকম হুম্ হুম্ আওয়াজটা আর ছেড়ো না।···যা বলছিলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অন্যান্য তারকামণ্ডলও চেনাজানা। কিন্তু এর পরেই যা ঘটল, তা এমনই সৃষ্টি ছাড়া যে দেখেই প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, সত্যি কথা বলতে কী, দু'চোখ কপালেও তুলে ফেলেছিলাম। সৃষ্টিছাড়া হলেও জিনিস দুটো অকাট্য প্রমাণ···তোমার অনুমানের নিরেট যুক্তি।"

এই পর্যন্ত বলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার স্তব্ধ হলেন এবং শব্দ করে দুই করতল ঘসতে লাগলেন।

শার্লক হোমস্ তখন যেন নাচার হয়েই বললে··· "মাই ডিয়ার চ্যালেঞ্জার, আমার হুম বিস্ময়োক্তিটা আপনার কাছে যতখানি পীড়াদায়ক, তার চাইতেও বেশী পীড়া-দায়ক আপনার ঐ হাতঘসার শব্দটা আমার কাছে।"

"তাই নাকি ?" ঘন ভুরু নাচিয়ে বললেন চ্যালেঞ্জার।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। তাছাড়া, কথা বলতে বলতে ঠিক কাজের কথার জায়গায় এসে থেমে যাওয়াটাও ঠিক নয়··· এতে চিন্তার ট্রেন উল্টে যায়।"

"আ-চ্ছা !" ফের ভুরু নৃত্য করেই বললেন প্রফেসর ···"কদ্দুর বলেছিলাম ?"

"দুটো জিনিস দেখেছিলেন···অকাট্য প্রমাণ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশ্চয গ্রহের আকাশে দুটো জিনিস। হঠাৎ দিগন্তে চাঁদ উঠল। একটা নয়, দু'টো। দু'টোই খুব ছোট, রীতিমত এবড়ো-খেবড়ো পৃষ্ঠদেশ ; এদের একটা এত জোরে উঠে এল এবং এমন পাঁই পাঁই করে গ্রহ পরিক্রমা শুরু করে দিলে যে আমি নিজেও দেখতে পেলাম তার দ্রুত গতি। দেখতে দেখতে ডবল চাঁদ সরে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।" ভীমবেগে বাম করতলে ডান মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন চ্যালেঞ্জার "ভায়া···হোম্স্, অকাট্য প্রমাণটা কী, এবার বুঝেছো ?"

গম্ভীর হয়ে গেল হোম্স্।

বললে···"বুঝেছি। সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা মানে সৌর জগতের আকাশ দেখা। আর যমজ চাঁদ দেখা মানে মঙ্গলগ্রহের আকাশ দেখা। তারাদের প্রতিবেশী রক্ত-রাঙাগ্রহ মঙ্গলের আকাশেই কেবল দেখা যায় ডবল চাঁদ··· ডিমোস আর ফোবোস।"

"হোম্স্, মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক দৃশ্যই দেখেছি আমরা ···যমজ চাঁদই তার অকাট্য প্রমাণ," প্রকাণ্ড মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রফেসর।

"সূযে র অস্তিত্বের মতই অকাট্য এবং পরম সত্য।"

ঠিক এই সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। মুখ বাড়িয়ে বিলি বললে···"মিস্টার হোম্স্, এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।"

বিলির কথা শেষ হতে না হতেই পাল্লা আরও ফাঁক করে সুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল নার্ভাস প্রকৃতির এক টেকো পুরুষ। এক হাতে টুপিটা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না···চালান করছে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে, আবার বাঁ হাত থেকে ডান হাতে। টুপিটা যেমন নোংরা, তেমনি বদখৎ।

"স্যার," কেসে-টেসে গলা সাফ করে নিয়ে বললে আগন্তুক···"আমি বলডুইন বলছি।"

শুষ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুষ্কতর কণ্ঠে বলল শার্লক হোম্স্···"চিনতে পেরেছি।"

আরও ঘাবড়ে গেল বলডুইন।

"আপনি কি খুবই ব্যস্ত ?"

"একটু।···দু'মিনিট সময় দেওয়া যাবে আপনাকে।"

তড়বড় করে উঠল বলডুইন···"স্যার, কৃস্ট্যাল ডিমটার দাম পাঁচ পাউণ্ড নয়···অনেক বেশী।"

"হতে পারে। কিন্তু বেচেছেন পাঁচ পাউণ্ডে··· দামটা চড়াতেও এসেছেন অনেক দেরীতে।"

"মর্স হাডসন বলছিল, আরও বেশী দাম পাওয়া যাবে দুই ভদ্রলোকের কাছে। একজন সেণ্ট ক্যাথরীন হাসপাতালের মিস্টার জ্যাকব ওয়েজ। আর একজন জাভার প্রিন্স অফ বসো-কুনি। দুজনেই টাকার কুমীর। এঁদের কাছ থেকে দুটো পয়সা বেশী লাভ করলে আমি আর মর্স হাডসন ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম।"

কঠোর হল শার্লক হোমসের ধূসর চক্ষু, চোয়ালের হাড় এবং কণ্ঠস্বর—"বলডুইন, মর্স হাডসনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে জেলে যাওয়ার পথটা আপনি নিজেই পরিষ্কার করে রেখেছেন। চোরাই আংটি যদি আপনার দোকান ঘরে ফেরং না দিত, আপনাদের দু'জনকেই শ্রীঘর দর্শন করিয়ে ছাড়তাম। আর, এখন তার উস্কানিতে বেশী মুনাফার লোভে যে জিনিসটা ফেরং নিতে এসেছেন আমার দখলে আর তা নেই।"

গুড়-গুড় করে মেঘ ডাকা গলায় চ্যালেঞ্জার বললেন— "খাঁটি কথাই বলেছেন মিস্টার হোমস্। জিনিসটা ওর দখলে আর নেই।"

ফোঁস করে উঠল বলডুইন—"বুঝব কি করে যে উনি খাঁটি কথা বলেছেন? তাছাড়া আমাদের কথায় আপনি ফোড়ন দিতে আসছেন কেন? আপনাকে তো আমি চিনি না।"

আর যায় কোথা! তড়াক করে গরিলা সদৃশ বপু নিয়ে অবিশ্যাস্য বেগে চেয়ার থেকে ছিটকে গেলেন প্রফেসর,—"কী! আমার কথায় অবিশ্বাস। বংস ইঁদুর, আমার নাম জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।—হোমস্, পথ ছাড়ো—ইঁদুরটাকে এখান থেকেই সোজা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি রাস্তায়।"

সেই রুদ্র মূর্তি, বাজ খাঁই কণ্ঠস্বর, নীল চোখের আগুন দেখেই প্রকৃতই ইঁদুরের মত চক্ষের নিমিষে সড়াৎ করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল বলডুইন। ইঁদুর ছোঁড়ার এমন সুযোগ হাত ফস্‌কে যাওয়ায় চ্যালেঞ্জার আরক্ত মুখে ফের আসন গ্রহণ করলেন চেয়ারে।

বললেন কালবৈশাখী গলায়—"রাস্কেলটাকে যদি ধরতে পারতাম···যাকগে, কুস্ট্যাল নিয়ে আরো গবেষণার দরকার। হোমস্, ব্যাপারটা আপাততঃ তোমার আমার মধ্যেই গোপন থাকুক—আর কাউকে বোলো না।"

"সেকি! বৈজ্ঞানিক মহলের মতামত দরকার যে!"

"বৈজ্ঞানিক মহল!" চ্যালেঞ্জার মনে হল জীবন্ত আগ্নেয়-গিরির মত গুম্-গুম্ করে উঠলেন—"তারা নতুন তত্ত্ব আর অভিনব তথ্যের বোঝে কী? বাগড়া দিতে জানে, তর্ক করতে জানে, মূর্খের দল!—না, হোমস্, কাউকে না। আজ বিকেলে চারটের সময়ে এসো আমার বাড়ীতে।"

"আসবো। ডাক্তার ওয়াটসনকে বলব? ওর মাথা কিন্তু সাফ।"

"প্লীজ। এখন কাউকে নয়। আসি এখন।"

[তিন]

মঙ্গলের উড়ন্ত বিভীষিকা

সেইদিনই বিকেলে এনমোর পার্কের পড়াশুনার ঘরে ফের কুস্ট্যাল নিয়ে তন্ময় হলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং শার্লক হোম্‌স্। কালো কাপড়ের অবগুণ্ঠনে দুই স্বনামধন্য পুরুষ নিজেদের মুণ্ড ঢেকে দৃকপাত করলেন বিচিত্র কুস্ট্যালের পানে। বাইরের ছিটেফোঁটা আলো পর্যন্ত প্রবেশ পথ খুঁজে পেল না ঘোমটার আড়াল দিয়ে।

যেই বন্ধ হল আলোর প্রবেশ পথ, অমনি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দ্যুতি বিকিরণ শুরু করে দিলে কুস্ট্যাল বল। সাধারণ দ্যুতি নয়—যেন নীল আভা ঠিকরে বেরোতে লাগল ভেতর থেকে। হোমসের ধারালো নাক চিবুক আলোকিত হল নীলাভ আভায়, আলোকিত হল চ্যালেঞ্জারের বিশাল দাড়ির জঙ্গল। দু'হাতের মধ্যে সন্তর্পণে কুস্ট্যালকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সঠিক অবস্থায় আনবার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন প্রফেসর।

সফলও হলেন। আচম্বিতে দেখা গেল পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা। তালগোল পাকিয়ে সরে সরে যাচ্ছে কুয়াশা আবৃত দৃশ্যপট থেকে।

সোল্লাসে, কিন্তু চাপা গলায় বললেন চ্যালেঞ্জার—"আসছে!"

সত্যিই আসছে। অদ্ভুত সেই দৃশ্যপট, সেই নিসর্গ দৃশ্য, ফের ফিরে আসছে কুস্ট্যালের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে লালচে-বাদামী রঙের দিগন্ত ছাওয়া পাহাড় শ্রেণী—যা কিনা দেখতে উঁচু বাঁধের মতই, দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের মত বহুদূর বিস্তৃত মঞ্চের মত। অবশেষে কুয়াশা আরও দূরীভূত হল—স্পষ্টতর হয়ে উঠল সারিবদ্ধ সুউচ্চ মাস্তুল শ্রেণী—প্রতিটির শীর্ষ দ্যুতিময়। নির্মেঘ গাঢ় নীল আকাশে সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল টলটলে পরিষ্কার কিন্তু পাণ্ডুর সূর্যের মুখ।

চ্যালেঞ্জার বললেন—পৃথিবীর ওপরে সূর্যের যে সাইজ এ যে দেখছি তার অর্ধেক। কারণও আছে। খুব কাছাকাছি এলেও, পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে মঙ্গলের দূরত্ব সাড়ে তিন কোটি মাইল হয়। কাজেই মঙ্গলের আকাশে সূর্য তো ছোটই দেখাবে। আরে! আরে! ওরা কারা হোমস্?"

নিচের ছাদে কারা যেন নড়ছে। গোল বতুলের মত দেহ তাদের। চকচকে। চারপাশ দিয়ে বেরিয়েছে অনেকগুলো শুঁড়। এই শুঁড়ের ওপর ভর দিয়েই তারা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে লম্বাচওড়া আয়তাকার ক্ষেত্রের ওপর!

হোম্‌স্‌ও দেখেছিল চলমান প্রাণীদের।

বললে পাতলা ঠোঁট শক্ত করে—"চ্যালেঞ্জার, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমরা যা কিছু দেখছি ঐ মাস্তুলেরই কোনো একটার মাথা দিয়ে দেখছি। মাস্তুলগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ীর ছাদে। তাই দূরের জিনিস অত স্পষ্ট কিন্তু নিচের কাছের দৃশ্য দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।"

রুদ্ধশ্বাসে চ্যালেঞ্জার বললেন—"ঠিকই বলেছো। আমারও তাই মনে হচ্ছে। সব বাড়ীর ছাদেই অদ্ভুত প্রাণীরা টহল দিচ্ছে। ঠিক যেন অক্টোপাস, মাকড়শা, কাঁকড়ার

দল। আরে গেল যা, এ যে দেখছি উড়তেও পারে!"

সহসা খুব কাছের একটা ছাদ থেকে বহু শুঁড় বিশিষ্ট গোল বলের মতন চকচকে কালো দেহ নিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল একটা প্রাণী। বাদুড় যেমন চামড়া দিয়ে জোড়া প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে উড়ে যায় পৃথিবীর আকাশে, অনেকটা সেইভাবেই আশ্চর্য কিন্তু বদখৎ সেই প্রাণীটা শূন্যে উড়ে এল অবলীলাক্রমে—ক্রমশঃ ওপরে উঠতে উঠতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল কৃস্ট্যালের মধ্যে।

"অ। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে একমত হওয়ার আগে একটু তর্ক করতে চাই।"

"পরে করবেন। ঐ দেখুন, মঙ্গলের জীব এবার এদিকেই আসছে।"

বাস্তবিকই, কাছের মাস্তুলশীর্ষ ছেড়ে দিয়ে সটান যেন ওঁদের দিকেই উড়ে আসছে উড়ুক্কু জীবটা।

ঝড়ের বেগে চ্যালেঞ্জার বললেন—"অদ্ভুত ডানা তো—একদম নাড়ছে না।"

হোম্স্ বললে শীতল কণ্ঠে—"ডানা নাও হতে পারে।"

ওঁদের দিকেই উড়ে আসছে উড়ুক্কু জীবটা……

হোম্স্ বললে—"ডানা নাড়ছে না কিন্তু।"

"হয়ত নাড়ানোর মত ডানা নয়—তাই নাড়ছে না।"

হোম্সের দিকেই উড়ে আসতে আসতে হঠাৎ অন্যদিকে উড়ে গেল উড়ুক্কু প্রাণীটা। কাছের একটা মাস্তুলশীর্ষে পৌঁছে লিকলিকে শুঁড় দিয়ে মাস্তুল আঁকড়ে ধরে চেপে বসল ডগায়।

বিষম উত্তেজিত হয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন—"হোম্স্! হোম্স্! খুঁটির ডগায় কি করছে বলোতো?"

"আমরা যা করছি—তাই।"

"তার মানে?"

"আমরা যেমন কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখছি—মঙ্গলের প্রাণীও হয়তো তেমনি দেখছে আমাদের।"

"তবে কী?"

"মেশিন। ওড়বার যন্ত্র।"

"রাবিশ। চেহারা যাদের পোকার মত, তাদের আবার ওড়বার মেশিন; হোম্স্, কল্পনাকে বেশী ছুটিও না। আমার মতে, এটা হয় পুরুষ, না হয় স্ত্রী। ব্যাটাছেলে অথবা মেয়েছেলেরা উড়তে পারে—তাই একদল ছাদে নড়ছে—উড়তে পারছে না।—এসে গেছে।"

একদম কাছে এসে গেছে উড়ুক্কু প্রাণী। কৃস্ট্যালের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল একজোড়া ভাঁটার মত সুবিশাল চোখ যেন ওঁদের দিকেই চেয়ে রয়েছে নিষ্পলকে। পরমুহূর্তেই আরো কাছে এসে গেল মঙ্গলগ্রহী। ডানা আর দেখা গেল না—শুধু একজোড়া চোখ। তারপরেই

কৃস্ট্যালের বুক জুড়ে শুধু একজোড়া চোখ হিমশীতল চাহনি মেলে চেয়ে রইল ওঁদের দিকে।

এক লহমার জন্যে ঘটল এই কাণ্ড। মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশির করে উঠল অপার্থিব সেই চাউনির সামনে।

পরক্ষণেই অন্ধকার হয়ে গেল কৃস্ট্যালের ভেতরটা। একরাশ নীলাভ দ্যুতি কেবল ঠিকরে এল ভেতর থেকে। আর কিছু না।

কালো কাপড়ের ঘোমটা নিক্ষেপ করে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। কাগজ পেনসিল এনে ধপাস করে বসলেন চেয়ারে।

বললেন রুদ্ধশ্বাসে—"হোম্‌স্, তুমিও লেখো। আমিও লিখি। এইমাত্র যা দেখলাম—তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে ফেলি অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে।"

সেকেণ্ড কয়েক কাগজের কলম আর পেনসিল চলার খচমচ আওয়াজ এবং প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সেই নাসিকা-ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

তারপর পেনসিল নামিয়ে রেখে প্রফেসর বললেন—"মঙ্গলের একটা শহর দেখলাম এইমাত্র। দেখলাম তাদের ঘরবাড়ী। আর দেখলাম মঙ্গলের জীব তাদের কেউ কেউ উড়তেও পারে। তারা পোকা শ্রেণীর—তাই অমন অক্টোপাশের মত দেহ।"

হোম্‌স্ বললে—"চ্যালেঞ্জার। আপনি সইতে পারেন না—কিন্তু যুক্তি মানেন। সেই ভরসাতেই ফের বলছি—যে জীবটা উড়ে এসে আমাদের দেখে গেল—সে নিজে থেকে ওড়ে নি—যন্তর লাগিয়ে উড়েছে। পোকা বলে তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করবেন না। মঙ্গলের সভ্যতা পৃথিবীর সভ্যতার চেয়ে অনেক এগিয়েছে বলেই তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমরা ধরতে পারছি না।"

"কোন যুক্তিতে একথা বলা হল?" থমথমে মুখে শুধালেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

হোম্‌স্ বললে—"এককালে তিমি ডাঙায় ছিল—জলে গিয়ে তাদের ডাঙার উপযুক্ত প্রত্যঙ্গগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে। মঙ্গলের বুকে যাদের বদখৎ বপু দেখে পোকা বলছেন, অক্টোপাস বলছেন—কে জানে বিরাট ঐ দেহের মধ্যে তাদের ব্রেনটা এত বিরাট বলে লক্ষ লক্ষ বছর কেবল ব্রেনটা খাটিয়ে গেছে—হাত পায়ের মত প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেনি বলে তারা আজ লিকলিকে শুঁড় হয়ে গিয়েছে।"

ঘোঁৎ করে শব্দ করে দাড়ি চুলকে প্রফেসর বললেন—"মন্দ বলো নি। যুক্তি জিনিসটা আমিও মানি। হোম্‌স্, তোমার খাঁটি বিজ্ঞানের লাইনে আসা উচিত ছিল।"

(ক্রমশঃ)

ধাঁধা

সুনীত রায়

আমরা আজ একটু অন্য ধরনের ধাঁধার আলোচনা করব। এগুলো হল যুক্তিমূলক ধাঁধা। রঞ্জন, ইন্দ্র, রূপা আর সীমা এঁরা পেশায় কেউ ডাক্তার, কেউ হিসাব পরীক্ষক, কেউ শল্য চিকিৎসক আবার কেউ উকিল। এঁদের মধ্যে যিনি হিসাবপরীক্ষক, তিনি ইন্দ্রর হিসেবপত্তর দেখাশুনো করেন আর তার পরিবর্তে ইন্দ্র ঐ হিসাব পরীক্ষকের অসুখ-বিসুখে দেখাশুনো করেন। আবার রূপার শল্যচিকিৎসাস্থল সীমার অফিসের কাছে হলেও—রূপা ও সীমার মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিল না। রূপা আবার হিসাবপরীক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করতেন। এর থেকে তোমরা কি কেউ বলতে পারবে—রঞ্জন, ইন্দ্র, রূপা আর সীমার কার কি পেশা ছিল?

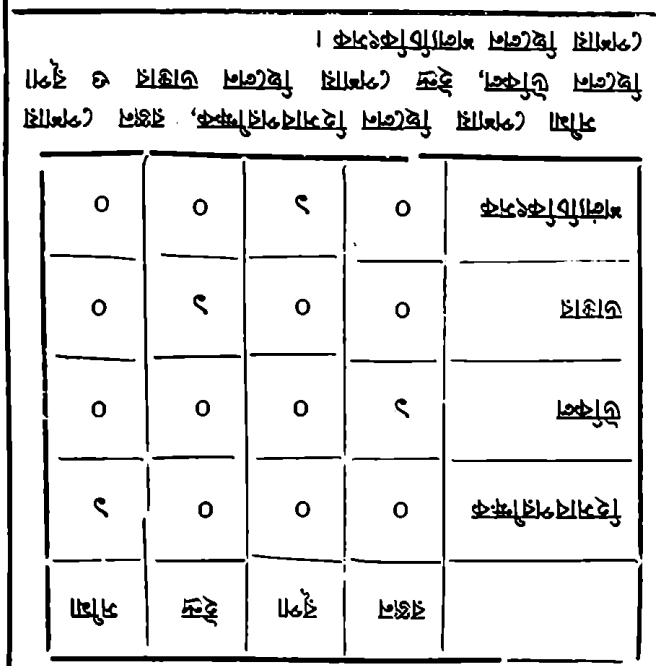

মরুভূমি কেন ?

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত লিখেছেন,

'চেরাপুঞ্জির থেকে
একফালি মেঘ ধার দিতে পার,
গোবি সাহারার বুকে।'

কবি হলেও যতীন্দ্রমোহন ছিলেন প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী। তাই হয়তো কবিতার এই কয়েকটি লাইনের মধ্যেই উত্তর দিতে পেরেছিলেন 'মরুভূমি কেন?' —এই কূট জটিল প্রশ্নের। চীনের গোবি ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির বুকে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য কেবল এক ফালি জলভরা মেঘ ধার চেয়েছিলেন কবি। তাঁর বিশ্বাস ছিল মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি পেলে গোবি ও সাহারা আর মরুভূমি থাকবে না। ধূ ধূ বালিময় প্রান্তর পরিণত হবে সবুজ প্রাণময় প্রান্তরে. এই বিশ্বাসের কথাই তিনি বলেছেন কবিতার কয়েকটি ছত্রে। এত কম কথায় আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বোধহয় মরুভূমি সম্পর্কে এর চেয় বেশি আর কিছু বলতে পারবেন না।

'মরুভূমি কেমন জানো?' এমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে কোন স্কুলের ছেলেমেয়েই চেঁচিয়ে জবাব দেবে, 'কেন, বালি দিয়ে—' না, ঠিক হলো না। বালি হলেই কি মরুভূমি হবে! তবে তো যে কোন সমুদ্রের বেলা-ভূমিকেই মরুভূমি আখ্যা দেওয়া যায়। তাছাড়া সব মরুভূমিতেই কিন্তু বালি থাকে না। এমন মরুভূমিও আছে, যেখানে আছে শুধু পাথর আর পাথর। বালি প্রায় নেই বললেই চলে। এমন মরুভূমির নাম পাথুরে মরুভূমি (stony desert)।

আসলে মরুভূমি হলো এমন একটি অঞ্চল যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। অল্প বৃষ্টি হলেও বছরে ২০-২৫ সেনটিমিটারেরও কম। আবার এমন মরুভূমিও আছে যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ৫ সেনটিমিটারেরও কম। মিশরের ডাকলা মরুভূমিতে বছরে মাত্র ০·৪ সেনটিমিটার বৃষ্টি হয়।

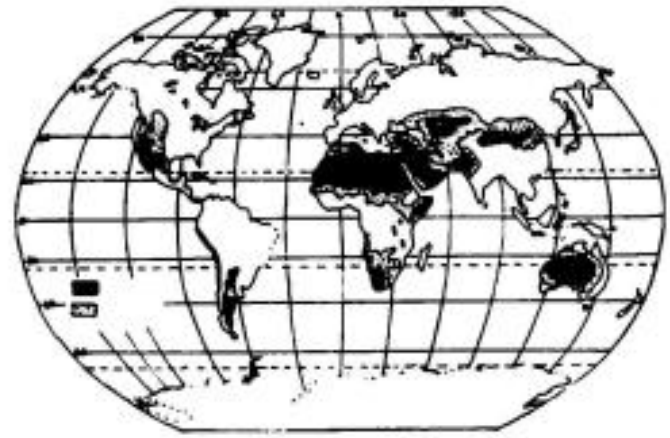

পৃথিবীর মরু অঞ্চল

রাজস্থানের থর মরুভূমিতে মরুদ্যান (শ্যামল নন্দীর সৌজন্যে)

যদিও পৃথিবীর কোন মরুভূমিই নিরক্ষরেখার ১৫ ডিগ্রির মধ্যে নেই, তবু মরুভূমিকে বলা যায় পৃথিবীর উষ্ণতম জায়গা। এর কারণ মরুভূমির বাতাসে তো জলকণা থাকে না, তাই সূর্যের আলো সরাসরি পৃথিবীতে এসে পড়ে। কিন্তু বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলে অধিকাংশ সময় মোট সূর্যের আলোর শতকরা ৫০ ভাগ পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। কিন্তু মরুভূমিতে অনেক সময় শতকরা ৯০ ভাগ সূর্যের আলো এসে পৌঁছয়। ফলে কী পরিমাণ গরম পড়ে তা' সহজেই অনুমেয়। রাজস্থানের থর মরুভূমিতে তো উত্তাপ উঠে যায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। লিবিয়ার আজিজিয়ায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা হয়েছে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! রাতের বেলায় এসব জায়গায় তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্য ডিগ্রিরও নিচে। গোবি মরুভূমিতে শীতের রাতের গড় তাপমাত্রা −১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

যে অল্প বৃষ্টিপাত হয় মরুভূমিতে তাতে ক্যাকটাস ছাড়া আর বিশেষ কোন গাছ হয় না, কারণ এদের জলের চাহিদা খুবই কম। তাছাড়া মরুভূমিতে মাঝে মাঝে মরূদ্যানও দেখা যায়। এখানে ছোট জলাশয় ও খেজুর গাছের বন গড়ে ওঠে।

মরুভূমি কেমন হয়, তাতো মোটামুটি জানা গেল। এবার দেখা যাক কোথায় কীভাবে কত রকমের মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীতে যত মরুভূমি রয়েছে, তাদের মোটামুটি ভাগ করা যায় চার ভাগে।

(১) **ক্রান্তীয় অঞ্চলের মরুভূমি :** নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে যে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা, এই দু'টি রেখার কাছাকাছিই পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমির অবস্থান। এর মূল কারণ, সূর্যের তাপ সবচেয়ে বেশি এই অঞ্চলেই পৌঁছয়। কিন্তু এই দু'টি রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে মেরু অঞ্চলে সূর্যের আলো তীরছাভাবে পড়ায় তাপের পরিমাণ অনেক কম। নিরক্ষরেখা অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের মধ্যে তাপের পার্থক্যের ফলে স্বভাবতই নিরক্ষরেখা অঞ্চল থেকে উষ্ণ জলকণাবাহী বাতাস উত্তর ও দক্ষিণদিকে বইতে শুরু করে। এই জলকণাবাহী হাওয়া ওপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে এলে বৃষ্টিপাত হয়। তারপর সেই জলকণাহীন ঠাণ্ডা হাওয়া ওপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে এলে বৃষ্টিপাত হয়। তারপর সেই জলকণাহীন ঠাণ্ডা হাওয়া ভারী হয়ে মরুভূমি অঞ্চলে আস্তানা জমায়। কিন্তু সেই ভারী ঠাণ্ডা বাতাসে জলকণা না থাকায় বৃষ্টিপাত হয় না। এমন কি মরুভূমি জুড়ে এই হাওয়া দখল নিয়ে বসে থাকায়, হালকা জলকণাবাহী হাওয়া

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথভ্যালী মরুভূমি

আর ঢুকতে পারে না এই অঞ্চলে। ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা দুরন্ত থেকেই যায় চিরদিন।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমিগুলির অবস্থানও এই অঞ্চলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি উত্তর আফরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে আরব, পাকিস্তান হয়ে ভারতের থর মরুভূমি পর্যন্ত ৮০০ মাইল বিস্তৃত। আফরিকার সাহারা মরুভূমির মোট আয়তন ৯০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের মতো, যার মধ্যে দু'তিনটে ভারতবর্ষ অনায়াসেই এঁটে যাবে। যে মরুভূমি অঞ্চলের শুরু আফরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে, তা ভারতে প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে যায়। রাজস্থানের থর মরুভূমির (২৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার) পরই শুরু হয় বৃষ্টিসিক্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা। বৃষ্টির দাপটে থমকে যায় মরুভূমির আগ্রাসন।

আরেকটি ক্রান্তীয় মরুভূমির অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর মেকসিকো অঞ্চলে। আয়তন প্রায় ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কালাহারি মরুভূমির অবস্থান মকর ক্রান্তীয় অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম আফরিকার নামিবিয়ায়।

(২) **মহাদেশীয় মরুভূমি** : শুধু ক্রান্তীয় অঞ্চলে নয়, মরুভূমি গড়ে ওঠে সমুদ্র থেকে বেশ দূরে মহাদেশের ভেতরেও। এসব ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো সমুদ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে জলকণাবাহী হাওয়া এতদূরে আর পৌঁছতে পারে না। আগেই বৃষ্টিপাত হয়ে জলকণা ফুরিয়ে যায়। চীনদেশের টাকলামাকান ও গোবি মরুভূমি এই জাতের মধ্যেই পড়ে। এখানে আর একটি কথা। মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এই দু'টি মরুভূমি কিন্তু মোটেই গরম নয়, বরং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শুকনো।

(৩) **বৃষ্টিচ্ছায় মরুভূমি** : এ জাতীয় মরুভূমির সৃষ্টি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে। প্রকৃতিতে এমনও দেখা যায়, সমুদ্রের খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও ভূসংস্থানের বিন্যাসের জন্য বৃষ্টিপাত হতে পারে না। ফলে মরুভূমির সৃষ্টি। এ ধরনের মরুভূমি রয়েছে ক্যালিফোরনিয়ার ডেথ ভ্যালিতে, আরজেনটিনায় প্যাটাগনিয়ায়। প্রথম ক্ষেত্রে রকি পর্বত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আনদিজ পর্বত থাকায় প্রশান্ত মহাসাগর থেকে জলকণাবাহী হাওয়া বৃষ্টিপাত দেয় পর্বতের পশ্চিম ঢালে, পূর্ব ঢালের জন্য আর কিছু বাকি থাকে না।

(৪) **উপকূলীয় মরুভূমি** : শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে স্থলমুখী সমুদ্র হাওয়া কোথাও কোথাও এত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে যে, সেই হাওয়ায় কোন জলকণা থাকতেই পারে না, স্থলভাগে প্রবেশ করার আগেই বৃষ্টিপাত ঘটে যায়। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমুদ্রের উপকূলেই সৃষ্টি হয়েছে মরুভূমি। সমুদ্রের পাড়ে এ ধরনের মরুভূমি দেখলে মনে পড়ে যায় সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন, 'Water', Water **every** where, not a to drink। মরুভূমির এত কাছে ফিরোজা নীল সমুদ্র, অথচ কৃপণের মতো বৃষ্টি দেয় না নিজের নিকটতম প্রতিবেশীকে। কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির খেয়াল। এ ধরনের মরুভূমি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে পেরু ও চিলির আটাকামায়। পাশেই সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও এখানে বছরে বৃষ্টিপাত হয় মাত্র ১·৫ সেনটিমিটার।

পৃথিবীর সমস্ত মরুভূমিগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন মরুভূমিই এলোপাথারিভাবে যেখানে সেখানে তৈরি হয় নি। অধিকাংশ মরুভূমিই রয়েছে ১৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি উত্তর অথবা দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে। মরুভূমি-প্রধান পাঁচটি অঞ্চল হলো : উত্তর আফরিকা-ইউরেশিয়া, দক্ষিণ আফরিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অসট্রেলিয়া। অবস্থান হিসেবে বিচার করে দেখা যায়, নিয়মমতো গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে মরুভূমি হবার কথা ছিল। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর দাপটে মরুভূমি ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে নি। এজন্য আমরা নিশ্চয়ই মৌসুমী বায়ুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারি।

* জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, নংগ্রিম হিলস্
শিলং ৭৯৩০০৩

পৃথিবীর প্রধান মরুভূমিসমূহ

সাহারা মরুভূমি (আফরিকা) ৩০,০০,০০০ বর্গমাইল
অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি ৬,০০,০০ বর্গ মাইল
আরব মরুভূমি ৫,০০,০০০ ,,
গোবি মরুভূমি (সাইবেরিয়া) ৪,০০,০০০ বর্গ মাইল
কালাহারি মরুভূমি ২,০০,০০০ বর্গ মাইল
থর মরুভূমি (ভারত) ১,০০,০০০ ,,

রসায়নের সহজপাঠ (২)

অমরনাথ রায়

প্রথম অধ্যায়ে মৌলের চিহ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সত্ত্বেও কয়েকটি কথা বাদ পড়ে গেছে। সেই কথাগুলি আগে সেরে নিয়ে এই অধ্যায়ের বক্তব্য শুরু করব।

প্রকৃতিজাত মৌলিক পদার্থগুলি সংখ্যায় 92টি। আধুনিক 'পর্যায় সারণী'তে (যে তালিকায় মৌলগুলিকে তাদের ক্রমবর্ধমান 'পরমাণু ক্রমাঙ্ক' অনুসারে সাজানো হয়েছে) ইউরেনিয়াম (চিহ্ন U, পরমাণু-ক্রমাঙ্ক 92) এর পর বেশ কয়েকটি মৌল রসায়ন বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলিকে বলা হয় 'কৃত্রিম মৌল'। আজ পর্যন্ত এগারোটি কৃত্রিম মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির নাম যথাক্রমে—নেপচুনিয়াম (Np), প্লুটোনিয়াম (Pu), আমেরিসিয়াম (Am), ক্যুরিয়াম (Cm), বার্কেলিয়াম (Bk), ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf), আইনস্টাইনিয়াম (E), ফারমিয়াম (Fm), মেণ্ডেলিভিয়াম (Mv), নোবেলিয়াম (No), এবং লরেনসিয়াম (Lw)।

প্রকৃতিজাত ও কৃত্রিম, সব মিলিয়ে আজ পর্যন্ত মোট 103টি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রকৃতিজাত মৌলগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং কৃত্রিম মৌলগুলি অস্থায়ী। কোন কোন কৃত্রিম মৌলের পরমায়ু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র!

প্রতিটি মৌলের সঙ্গে তার চিহ্ন, পারমাণবিক গুরুত্ব ও যোজ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই প্রতিটি মৌলের নাম, চিহ্ন, যোজ্যতা ও পারমাণবিক গুরুত্ব জানা একান্ত দরকার।

আবার একটা নতুন শব্দ এসে গেল 'যোজ্যতা'। যোজ্যতার কথা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আপাততঃ যোজ্যতার সংজ্ঞাটি জেনে রাখলেই চলবে।

কোন মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা কোনও হাইড্রোজেন এর যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে, সেই সংখ্যাটিই সেই মৌলের যোজ্যতা। যোজ্যতাকে মৌলের যোজন ক্ষমতাও বলা হয়।

নীচে একটি তালিকা দেওয়া হলো। ঐ তালিকা থেকে মৌলের নাম, চিহ্ন, যোজ্যতা ও পারমাণবিক গুরুত্ব জানা যাবে। এই তালিকায় মৌলগুলিকে ক্রমবর্ধমান পরমাণু-ক্রমাঙ্ক অনুসারে সাজিয়ে লেখা হয়েছে।

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	মৌলের নাম	চিহ্ন	যোজ্যতা	পারমাণবিক গুরুত্ব
1	হাইড্রোজেন	H	1	1·008
2	হিলিয়াম	He	0	4·003
3	লিথিয়াম	Li	1	6·940
4	বেরিলিয়াম	Be	2	9·013
5	বোরন	B	3	10·82
6	কার্বন	C	2, 4	12·01
7	নাইট্রোজেন	N	3, 5	14·008
8	অক্সিজেন	O	2	16·00
9	ফ্লোরিন	F	1, 7	19·00
10	নিয়ন	Ne	0	20·183
11	সোডিয়াম	Na	1	22·997
12	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	2	24·32
13	অ্যালুমিনিয়াম	Al	3	26·79
14	সিলিকন	Si	4	28·06
15	ফসফরাস	P	3, 5	30·98
16	সালফার	S	2, 4, 6	32·066
17	ক্লোরিন	Cl	1, 3, 5. 7	35·457
18	আর্গন	A	0	39·944
19	পটাসিয়াম	K	1	39·096
20	ক্যালসিয়াম	Ca	2	40·08
21	স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	3	45·10
22	টাইটেনিয়াম	Ti	3, 4	47·90
23	ভ্যানেডিয়াম	V	3, 5	50·95
24	ক্রোমিয়াম	Cr	2, 3, 6	52·01
25	ম্যাঙ্গানিজ	Mn	2,3,4,6,7	54·93
26	আয়রন	Fe	2, 3	55·85
27	কোবাল্ট	Co	2, 3	58·94

পর্যায় সারণী (PERIODIC TABLE)

মৌল সংখ্যা	পর্যায় Period	শ্রেণী (Group) I A	I B	II A	II B	III A	III B	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII A	VII B	VIII	O
2	1	1 H 1·008															2 He 4·003
8	2	3 Li 6·94		4 Be 9·013			5 B 10·82		6 C 12·011		7 N 14·008		8 O 16·00		9 F 19·00		10 Ne 20·183
8	3	11 Na 22·991		12 Mg 24·32			13 Al 26·98		14 Si 28·019		15 P 30·975		16 S 32·066		17 Cl 35·457		18 Ar 39·944
18	4	19 K 39·10		20 Ca 40·08			21 Sc 44·96		22 Ti 47·90		23 V 50·95		24 Cr 52·01		25 Mn 54·94	26 Fe 55·85 27 Co 58·94 28 Ni 58·71	
			29 Cu 63·54		30 Zn 65·38		31 Ga 69·72		32 Ge 72·60		33 As 74·91		34 Se 78·96		35 Br 79·916		36 Kr 83·80
18	5	37 Rb 85·48		38 Sr 87·63			39 Y 88·92		40 Zr 91·22		41 Nb 92·91		42 Mo 95·95		43 Tc 99	44 Ru 101·1 45 Rh 102·91 46 Pd 106·4	
			47 Ag 107·88		48 Cd 112·41		49 In 114·82		50 Sn 118·70		51 Sb 121·76		52 Te 127·61		53 I 126·91		54 Xe 131·30
32	6	55 Cs 132·91		56 Ba 137·36		57 *La 138·92		72 Hf 178·6		73 Ta 180·95		74 W 183·86		75 Re 186·22		76 Os 190·2 77 Ir 192·2 78 Pt 195·09	
			79 Au 197·0		80 Hg 200·61		81 Tl 204·39		82 Pb 207·21		83 Bi 209·0		84 Po 210		85 At 210		86 Rn 222·0
17	7	87 Fr 223		88 Ra 226·05		89 Ac** 227		90 Th 232·05		91 Pa 231		92 U 238·07					

* ল্যান্থানাইডস (58—71)	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
** অ্যাক্টিনাইডস (90—103)	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lw

[সারণীতে চিহ্নের উপরে লিখিত সংখ্যা মৌলের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক এবং নিম্নে লিখিত সংখ্যা উহার পারমাণবিক গুরুত্ব]

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	মৌলের নাম	চিহ্ন	যোজ্যতা	পারমাণবিক গুরুত্ব
28	নিকেল	Ni	2	58·69
29	কপার	Cu	1, 2	63·54
30	জিঙ্ক	Zn	2	65·38
31	গ্যালিয়াম	Ga	3	69·72
32	জারমেনিয়াম	Ge	4	72·60
33	আর্সেনিক	As	3, 5	74·91
34	সেলিনিয়াম	Se	2, 4, 6	78·96
35	ব্রোমিন	Br	1,3,5,7	79·916
36	ক্রিপটন	Kr	0	83·70
37	রুবিডিয়াম	Rb	1	85·48
38	স্ট্রনসিয়াম	Sr	2	87·63
39	ইট্রিয়াম	Y	3	88·92
40	জারকোনিয়াম	Zr	4	91·22
41	নায়োবিয়াম	Nb	3, 5	92·91
42	মলিবডেনাম	Mo	3, 4, 6	95·95
43	টেকনেসিয়াম	Tc	4, 7	99·00
44	রুথেনিয়াম	Ru	3,4,6,8	101·70
45	রোডিয়াম	Rh	3	102·91
46	প্যালাডিয়াম	Pd	2, 4	106·70
47	সিলভার	Ag	1	107·88
48	ক্যাডমিয়াম	Cd	2	112·41
49	ইনডিয়াম	In	3	114·76
50	টিন	Sn	2, 4	118·70
51	অ্যান্টিমনি	Sb	3, 5	121·76
52	টেলুরিয়াম	Te	2, 4, 6	127·61
53	আয়োডিন	I	1,3,5,7	126·92
54	জেনন্	Xe	0	131·30
55	সিজিয়াম	Cs	1	132·91
56	বেরিয়াম	Ba	2	137·36
57	ল্যান্থানাম	La	3	138·92
58	সিরিয়াম	Ce	3, 4	140·13
59	প্রাসিওডিমিয়াম	Pr	3	140·92
60	নিওডিমিয়াম	Nd	3	144·27
61	প্রমিথিয়াম	Pm	2	147·00
62	স্যামারিয়াম	Sm	3	150·43
63	ইউরোপিয়াম	Eu	3	152·00
64	গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	3	156·90
65	টারবিয়াম	Tb	3	159·20
66	ডিস্প্রোসিয়াম	Dy	3	162·46
67	হোলমিয়াম	Ho	3	164·94
68	এর্বিয়াম	Er	3	167·27
69	থুলিয়াম	Tm	3	169·40
70	ইটারবিয়াম	Yb	3	173·04
71	লুটেসিয়াম	Lu	3	174·99
72	হ্যাফ্নিয়াম	Hf	3	178·60
73	ট্যান্টালাম	Ta	5	180·88
74	টাংস্টেন	W	0	183·92
75	রেনিয়াম	Re	...	186·31
76	অসমিয়াম	Os	2, 3, 4	190·20
77	ইরিডিয়াম	Ir	3, 4	193·10
78	প্লাটিনাম	Pt	2, 4	195·23
79	গোল্ড	Au	1, 3	197·20
80	মার্কারি	Hg	1, 2	200·61
81	থ্যালিয়াম	Te	1, 3	204·39
82	লেড	Pb	2, 4	207·21
83	বিসমাথ	Bi	3, 5	209·00
84	পোলোনিয়াম	Po	5	210·00
85	অ্যাস্টেটাইন	At	1, 5	211·00
86	রেডন	Rn	0	222·00
87	ফ্রানসিয়াম	Fr	...	223·00
88	রেডিয়াম	Ra	2	226·05
89	অ্যাক্টিনিয়াম	Ac	3	227·00
90	থোরিয়াম	Th	4	232·12
91	প্রোটো অ্যাকটিনিয়াম	Pa	3, 4, 5	231·00
92	ইউরেনিয়াম	U	4, 6	238·07
93	নেপচুনিয়াম	Np	3, 4, 5	237·00
94	প্লুটোনিয়াম	Pu	3,4,5,6	239·00
95	আমেরিসিয়াম	Am	3, 4, 5	241·00
96	ক্যুরিয়াম	Cm	3	242·00
97	বার্কেলিয়াম	Bk	3, 4	243·00
98	ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	3	244·00
99	আইনস্টাইনিয়াম	E	—	—
100	ফার্মিয়াম	Fm	—	—
101	মেণ্ডেলিভিয়াম	Mv	—	—
102	নোবেলিয়াম	No	—	—
103	লরেনসিয়াম	Lw	—	—

রসায়ন শাস্ত্রের বইতে কখনও কখনও একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় মৌলের চিহ্ন লেখা থাকে, যথা ${}_6C^{12}$, ${}_8O^{16}$ ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে মৌলের চিহ্নের উপরের ডান দিকে লেখা সংখ্যাটি মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বকে বোঝায়। অপরপক্ষে চিহ্নের বাঁ দিকে একটু নীচে লেখা সংখ্যাটি মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ককে বোঝায়। এর মধ্যে পারমাণবিক গুরুত্ব কাকে বলে তা আগেই বলা হয়েছে। বলা হয় নি পরমাণু-ক্রমাঙ্কের কথা।

পরমাণু ক্রমাঙ্ক ঃ

পরমাণু ক্রমাঙ্ক বলতে আমরা বুঝি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত 'প্রোটন' সংখ্যাকে।

আবার একটা অজানা শব্দ এসে গেল 'প্রোটন'। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরাতড়িৎ আধান যুক্ত যে সব প্রাথমিক কণা থাকে, তাদেরই বলা হয় 'প্রোটন'।

সাধারণ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুতে একটি মাত্র প্রোটন থাকে, হিলিয়ামের একটি পরমাণুতে 2টি প্রোটন থাকে। অনুরূপভাবে লিথিয়ামে 3টি, বেরিলিয়ামে 4টি, বোরনে 5টি এবং কার্বনে 6টি প্রোটন থাকে। অতএব এই সব মৌলের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক যথাক্রমে 1, 2, 3, 4, 5, এবং 6.

এবারে আসা যাক্ সংকেতের কথায়। (কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুকে যার দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়, তাকেই বলে 'সংকেত')

তার মানে সংকেত হলো মৌল অথবা যৌগের অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।

কোন মৌলের অণুর সংকেত লিখতে হ'লে ঐ মৌলের চিহ্নের ডান দিকে একটু নীচে যে ক'টি পরমাণু দিয়ে অণুটি গড়া, সেই সংখ্যাটি লিখতে হয়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থের অণু দ্বি-পরমাণুক বলে এদের অণুর সংকেত যথাক্রমে H_2, O_2 এবং N_2 ওজোন গ্যাস ত্রি-পরমাণুক অণু বলে এর সংকেত O_3. ফসফরাসের পারমাণবিকতা (অণুতে পরমাণুর সংখ্যা) 4 বলে তার সংকেত P_4, আবার হিলিয়াম, আরগন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পারমাণবিকতা এক (1) বলে, এদের অণুর সংকেত যথাক্রমে He ও A. এ ভিন্ন সোডিয়াম, মার্কারি, জিংক ইত্যাদি ধাতু বাষ্পীয় অবস্থায় এক-পরমাণুক বলে এদের ক্ষেত্রে চিহ্ন ও সংকেত একই হয় অর্থাৎ Na, Hg এবং Zn ই হয়।

যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু দিয়ে গড়া। তাই কোন যৌগের সংকেত লিখতে হ'লে সেই যৌগ গঠনকারী মৌলগুলির চিহ্ন পাশাপাশি লিখে প্রত্যেকটি চিহ্নের ডান দিকে একটু নীচে মৌলগুলির পরমাণু সংখ্যা লিখতে হয়। কিন্তু পরমাণু সংখ্যা এক (1) হলে তা লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণুতে একটি কার্বন পরমাণু এবং 2টি অক্সিজেন পরমাণু আছে। কাজেই উপরের নিয়ম অনুসারে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণুর সংকেত CO_2, অনুরূপভাবে, অ্যামোনিয়ার একটি অণুর সংকেত NH_3, কারণ অ্যামোনিয়ার একটি অণুতে তিন পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু নাইট্রোজেন আছে। আবার চিনির আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$, কারণ এতে 12টি কার্বন পরমাণু, 22টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 11 টি অক্সিজেন পরমাণু বর্তমান।

সংকেতের অর্থ ঃ

চিহ্নের মতো সংকেতও অর্থবহ। সংকেত—(i) মৌল বা যৌগের নামকে বোঝায় (ii) পদার্থের একটি অণুকে বোঝায় এবং অণুর গঠনে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের পরমাণু ক'টি ক'রে আছে, তাও বোঝায়। (iii) পদার্থটির আণবিক গুরুত্বকে এবং সংকেতে ঐ পদার্থ-গঠনকারী মৌলগুলির ওজনগত অনুপাত ও (পারমাণবিক গুরুত্ব অনুপাতে) প্রকাশ করে। (iv) গ্যাসীয় পদার্থের সংকেত লিখলে তা ঐ পদার্থের আণবিক গুরুত্বকে তো বোঝায়ই, উপরন্তু প্রমাণ উষ্ণতায় ও চাপে ঐ পদার্থের এক গ্রাম-অণুর (আণবিক গুরুত্বকে গ্রাম এককে প্রকাশ করলে) আয়তন যে 22·4 লিটার হয়, তাও বোঝায়।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে সংকেতের অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

Cl_2 লিখলে বুঝতে হবে ঃ

(i) এটি ক্লোরিন-এর একটি অণু। (ii) একটি ক্লোরিন অণুতে 2টি ক্লোরিন পরমাণু আছে। (iii) ক্লোরিনের আণবিক গুরুত্ব $(35·5 \times 2) = 71$ (iv) এক গ্রাম-অণু ক্লোরিন অর্থাৎ 71 গ্রাম ক্লোরিন প্রমাণ উষ্ণতায় ও চাপে 22.4 লিটার আয়তন অধিকার করে।

$MgCO_3$ সংকেতটি (i) ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট যৌগকে বোঝায়। (ii) যৌগটি ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত হয়, তাও বোঝায়। (iii) যৌগটির একটি অণুতে 1টি ম্যাগনেসিয়াম পরমাণু, 1টি কার্বন পরমাণু এবং 3টি অক্সিজেন পরমাণু আছে। (iv) যৌগটির আণবিক গুরুত্ব (24+12+48) = 84. (v) 84 ভাগ ওজনের ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের মধ্যে 24 ভাগ ওজনের Mg, 12 ভাগ ওজনের কার্বন এবং 48 ভাগ ওজনের অক্সিজেন আছে। তার মানে $MgCO_3$ এর অণু গঠনকারী মৌলগুলির ওজনের অনুপাত Mg : C : O = 24 : 12 : 48.

অণুর সংকেতের বাঁ পাশে কোন সংখ্যা লেখা থাকলে সেটা অণুর সংখ্যাকে বোঝায়। যেমন $2O_2$ লিখলে 2টি অক্সিজেন অণুকে বুঝতে হবে। $3H_2SO_4$ লিখলে বুঝতে হবে 3 অণু সালফিউরিক অ্যাসিডকে।

সোদক কেলাস ও কেলাস জল :

কোন কোন যৌগের 'সোদক কেলাস' হয়। সোদক কেলাসকে বুঝতে হ'লে আগে জানতে হবে 'কেলাস জল' কাকে বলে।

জলীয় দ্রবণ থেকে কেলাসনের সময় কতকগুলি কঠিন পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কেলাস বা স্ফটিকের আকৃতি লাভ করে। এই কেলাসগুলিকে 'সোদক কেলাস' বলে এবং এমন কেলাসের সঙ্গে সংযুক্ত জলকে 'কেলাস জল' বলে।

নীচে কতকগুলি সোদক কেলাস ও তার কেলাস জল-অণুর সংখ্যা দেওয়া হলো।

সোদক কেলাসের নাম	কেলাস-জল অণুর সংখ্যা
কপার সালফেট ($CuSO_4$)	$5H_2O$
ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$)	$7H_2O$
সোডিয়াম সালফেট ($NaSO_4$)	$10H_2$

এই যৌগগুলির আণবিক সংকেত লেখা হয় এইভাবে : $CuSO_4, 5H_2O$; $FeSO_4, 7H_2O$; $Na_2SO_4,, 10H_2O$।

অণু দু' রকমের মৌলিক অণু ও যৌগিক অণু। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, জিংক, ব্রোমিন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। এদের অণুকে আমরা বলি মৌলিক অণু। অপরপক্ষে, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। এদের অণুকে আমরা যৌগিক অণু বলে থাকি।

সংকেতের ক্রম নির্ণয় :

যৌগিক অণুর সংকেত লিখবার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুগুলির অবস্থান পরম্পরা সম্পর্কে কতকগুলি রীতি আছে। সেই রীতিগুলি এই রকম :

(i) ধাতু ও অধাতু দিয়ে গড়া অণুতে ধাতুর চিহ্ন প্রথমে বসে।

সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ সোডিয়াম ধাতু ও ক্লোরিন নামক অধাতুর দ্বারা গড়া। কাজেই এই রীতি অনুসারে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণুর সংকেতের প্রথমে বসবে ধাতুর (সোডিয়াম) চিহ্ন ; পরে বসবে অধাতুর (ক্লোরিনের) চিহ্ন। তার মানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক সংকেত হবে NaCl। অনুরূপভাবে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সংকেত হবে MgO, সোডিয়াম সালফাইডের সংকেত হবে Na_2S এবং ফেরিক ক্লোরাইডের সংকেত হবে $FeCl_3$।

(ii) কঠিন অধাতু ও গ্যাসীয় অধাতু দিয়ে গড়া অণুর সংকেতে কঠিন অধাতুর চিহ্ন বসে প্রথমে।

কার্বন-ডাই অক্সাইড গড়া— কঠিন অধাতু 'কার্বন' এবং গ্যাসীয় অধাতু 'অক্সিজেন' দিয়ে। অতএব এই রীতি অনুযায়ী কার্বন-ডাই অক্সাইডের আণবিক সংকেতের প্রথমে কঠিন অধাতু কার্বনের চিহ্ন বসবে। পরে বসবে গ্যাসীয় অধাতু অক্সিজেনের চিহ্ন। তার মানে কার্বন-ডাই অক্সাইডের আণবিক সংকেত হবে CO_2।

অনুরূপভাবে সালফার-ট্রাই অক্সাইডের আণবিক সংকেত SO_3 এবং সিলিকার আণবিক সংকেত SiO_2 হবে।

(iii) দু'টি গ্যাসীয় অধাতু অথবা একটি তরল অধাতু ও অপরটি গ্যাসীয় অধাতু দিয়ে গড়া যৌগের অণুর সংকেতের ক্ষেত্রে একটি পরমাণু তড়িৎ ধনাত্মক ও অপরটি তড়িৎ ঋণাত্মক হলে, প্রথমটির অর্থাৎ তড়িৎ ধনাত্মক মৌলটির চিহ্ন আগে বসে। কিন্তু অ্যামোনিয়ার সংকেত এই রীতির ব্যতিক্রম।

এই রীতির উদাহরণ হলো জলের আণবিক সংকেত H_2O, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আণবিক সংকেত HCl, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের আণবিক সংকেত HBr।

বলা বাহুল্য, 'হাইড্রোজেন' অধাতু হলেও তড়িৎ ধনাত্মক মৌল, আর 'ব্রোমিন' স্বাভাবিক অবস্থায় তরল মৌল।

আগেই বলেছি, অ্যামোনিয়ার আণবিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। সত্যিই তাই। অ্যামোনিয়ার আণবিক সংকেত NH_3, কিন্তু এই রীতি অনুযায়ী এর আণবিক সংকেত লিখতে হ'লে H_3N লেখা উচিত।

(iv) **হাইড্রোজেন ভিন্ন অন্যান্য অধাতুগুলি তড়িৎ ঋণাত্মক। তড়িৎ ঋণাত্মক দুটি অধাতু দিয়ে গড়া অণুর ক্ষেত্রে অধিকতর তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণুর চিহ্নকে পরে বসিয়ে সংকেত লেখা হয়।**

এই রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাইট্রিক অক্সাইড (NO)। এই যৌগে নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেন বেশী তড়িৎ ঋণাত্মক। অনুরূপভাবে গঠিত হয় ক্লোরিন মনক্সাইড (Cl_2O) ও নাইট্রোজেন ট্রাই ক্লোরাইডের (NCl_3) আণবিক সংকেত।

এবার নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরী কর :

[এক] কৃত্রিম মৌল কাদের বলে? পাঁচটি কৃত্রিম মৌলের নাম ও চিহ্ন লেখ।

[দুই] 2H এবং $2H_2$ এর মধ্যে পার্থক্য কি?

[তিন] $_{92}U^{238}$ এবং $_{26}Fe^{56}$ চিহ্ন দুটির অর্থ কি?

[চার] পরমাণু ক্রমাঙ্ক বলতে কি বোঝ? পটাসিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক কতো?

[পাঁচ] প্রোটনের প্রকৃতি কেমন? পরমাণুর কোন্ অংশে প্রোটন থাকে?

[ছয়] নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও সোডিয়াম পরমাণুতে যথাক্রমে ক'টি করে প্রোটন থাকে।

[সাত] সঙ্কেত কাকে বলে? অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক সংকেত লেখ।

[আট] 'পারমাণবিকতা' বলতে কি বোঝ? ওজোন ও ফসফরাস অণুর পারমাণবিকতা যথাক্রমে কতো?

[নয়] কোন্ কোন্ ধাতু বাষ্পীয় অবস্থায় এক-পরমাণুক হয়?

[দশ] Na_2CO_3 যৌগে কোন্ কোন্ মৌলের ক'টি ক'রে পরমাণু বর্তমান?

[এগার] H_2SO_4 সংকেতের অর্থগুলি লেখ।

[বার] $CaCl_2$ যৌগের আণবিক গুরুত্ব কতো?

[তের] CH_4 যৌগে কার্বন ও হাইড্রোজেনের ওজনগত অনুপাত কতো?

[চোদ্দ] 'সোদক কেলাস' ও 'কেলাস জল' বলতে কি বোঝ?

[পনের] এমন একটি যৌগের সংকেত লেখ, যার একটি অণুতে আটটি কেলাস জল অণু আছে।

[ষোল] মৌলিক অণু ও যৌগিক অণু বলতে কি বোঝায়? প্রতিটির একটি ক'রে উদাহরণ দাও।

[সতের] ক্যালসিয়াম ধাতু এবং অক্সিজেন অধাতু দিয়ে কোন যৌগ গঠিত হ'লে তার সংকেতে কোন্‌টির চিহ্ন আগে বসবে?

[আঠার] হাইড্রোজেন অধাতু, ক্লোরিনও অধাতু। এই দুই অধাতুর সংযোগে কোন যৌগ গঠিত হলে তার সংকেতে কার চিহ্ন আগে বসবে।

[উনিশ] কঠিন অধাতু ও গ্যাসীয় অধাতুর সংযোগে কোন যৌগ গঠিত হলে তার সংকেতে কোন্‌টির চিহ্ন আগে বসবে?

[কুড়ি] এক গ্রাম অণু অ্যামোনিয়ার আয়তন প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় কতো লিটার?

[একুশ] অ্যামোনিয়ার অণুর সংকেতে হাইড্রোজেনের চিহ্ন আগে বসে না কেন?

[বাইশ] নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে কোন্ মৌলটি বেশী অপরাতড়িৎধর্মী?

[তেইশ] নিম্নলিখিত মৌলগুলির চিহ্ন লেখ :

(i) ফার্মিয়াম (ii) থোরিয়াম (ii) অ্যাস্টেটাইন (iv) টাংস্টেন (v) মলিবডেনাম (vi) সেলিনিয়াম (vii) গ্যালিয়াম (viii) ক্রিপটন (ix) টাইটেনিয়াম (x) নিয়ন।

এন. বি./টি ৯৯এ নিউ ট্রাফিক, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

বিজ্ঞান বিচিত্রা

অনীশ দেব

একটি বিখ্যাত প্রশ্ন

যে প্রশ্নটা এখন তোমাদের করবো, সেটা হয়তো খুবই সহজ কিন্তু পৃথিবীর তিন-তিনজন নামী বিজ্ঞানী এই প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন। আর সেই কারণেই এই সহজ প্রশ্নটা এতো বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। এক বিজ্ঞান সভায় ডঃ জর্জ গ্যামো, পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহাইমার এবং নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফেলিক্স ব্লককে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিলো। সেরকম গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করায় ওঁরা তিনজনেই কিন্তু ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং, তোমরা খুউব ভালো করে ভেবে উত্তর দিও ঃ

এক দীঘির মাঝখানে পাথর বোঝাই একটা নৌকো ভাসছে। নৌকোর মাঝি হঠাৎ পাথরগুলো তুলে ছুড়ে ফেলে দিলো জলে। দীঘির জলের তল এখন বাড়বে না কমবে?

অনেকটা চেষ্টা করেও যদি না পারো, তাহলে উত্তরটা নীচে দেখে নিতে পারো। কিন্তু উত্তরের কারণটা তোমাদের নিজেদের খুঁজে বের করতে হবে।

উত্তর—দীঘির জলের তল নেমে যাবে।

পশুপাখির শরীরের তাপ ঃ এক আশ্চর্য ঘটনা

যদি শরীরের তাপমাত্রাকে এক নির্দিষ্ট মানে বেঁধে রাখতে হয় তাহলে শরীরের ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে যে তাপ তৈরী হবে, ঠিক সেই পরিমাণ তাপ প্রতি সেকেণ্ডে ছেড়ে

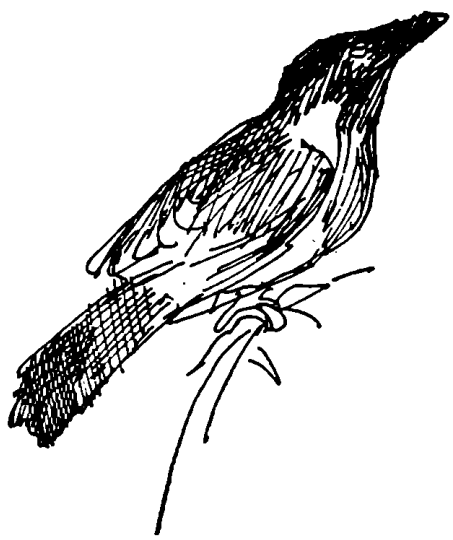

দিতে হবে বায়ুমণ্ডলে। জীবজগতের প্রতিটি পশুপাখি—এমন কি আমরা, মানুষরা পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলি। কারণ তোমরা তো জানোই, সুস্থ অবস্থায় আমাদের শরীরের তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে থাকে সাঁইতিরিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

প্রাণীদের শরীরের ভেতরে যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তা থেকেই উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় তাপ। কোনো প্রাণীর শরীরে কতোটা তাপ তৈরী হবে, সেটা নির্ভর করে তার আয়তনের ওপর। আর কি হারে সে তাপ বর্জন করতে পারবে, সেটা নির্ভর করে তার শরীরের ক্ষেত্রফলের ওপর। অতএব এই আয়তন ও ক্ষেত্রফলের ওপরেই নির্ভর করে দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মানে স্থির রাখতে কোনো প্রাণী তার প্রতি একক আয়তনে কি হারে তাপ তৈরী করবে।

একটা কাল্পনিক উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক।

ধরো দুটো বিভিন্ন প্রাণীর আয়তন হুবহু সমান। কিন্তু চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে, ধরো একজনের শরীরের ক্ষেত্রফল একশো বর্গ সে. মি. ও অপরজনের শরীরের ক্ষেত্রফল এক হাজার বর্গ সে. মি.। এখন যদি দুটো প্রাণীকেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

প্রক্রিয়ায় দুজনেই তাপ বর্জন করবে। ধরো, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে তাপ বর্জনের হার দুজনেরই সমান। তাহলে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রফল প্রথম জনের তুলনায় দশগুণ বেশি হওয়ায় তার তাপ বর্জনের পরিমাণ হবে দশগুণ বেশি। সুতরাং দুজনেরই শরীরের তাপমাত্রা সমান রাখতে হলে, দ্বিতীয় জনকে প্রথম জনের তুলনায় দশগুণ বেশি হারে তাপ তৈরী করতে হবে নিজের শরীরে।

এদের শরীরের ভেতর রাসায়নিক বিক্রিয়াও হয় খুব দ্রুত হারে—ফলে তাপ উৎপন্ন হয় প্রতি ঘণ্টায় শরীরের প্রতি সুমগ্রা ওজনে ০·৬৬ ক্যালরি। শুনলেঅবাক হবে, এই হার কোন হেলিক পটারের শক্তি উৎপাদনের হারের সমান অথচ একটা হামিংবার্ডের ওজন মাত্র ছয় থেকে আট গ্রাম। বিশাল প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই হার কিন্তু খুবই কম। যেমন হাতীর তাপ উৎপাদনের হার প্রতি ঘণ্টায় প্রতি

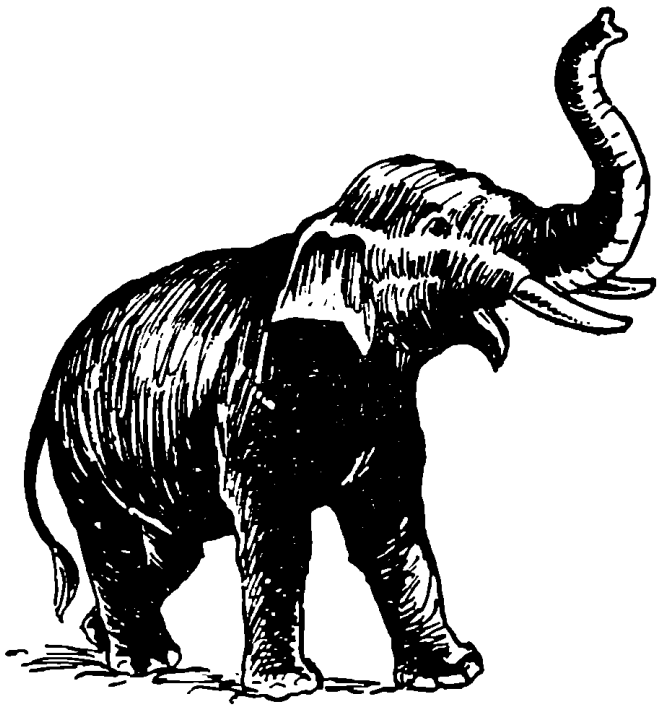

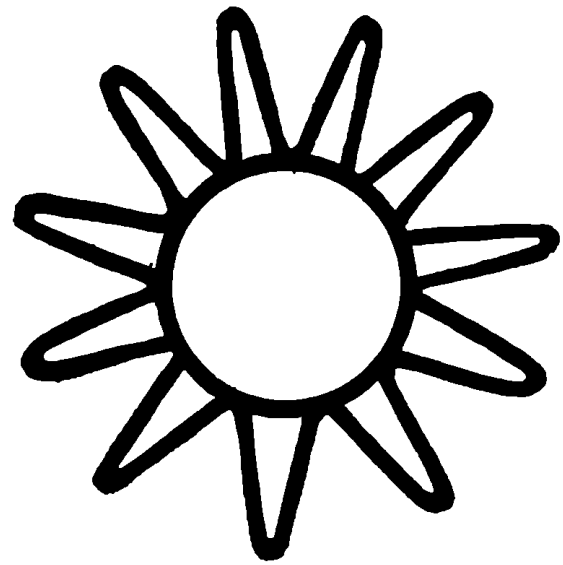

সুতরাং এ থেকে বোঝা গেলো, কোনো প্রাণীর তাপ তৈরীর হার নির্ভর করবে তার শরীরের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের অনুপাতের ওপর। প্রাণীর আকার যতো ছোট হয়, এই অনুপাতের মান ততো বড় হয়।

এবার দু-একটা সত্যিকারের উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক।

হামিংবার্ড নামে একরকম খুব ছোট্ট পাখি আছে। এদের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের অনুপাত খুব বেশী। সুতরাং গ্রাম ওজনে মাত্র ০·০১ ক্যালরি। হামিংবার্ডের সঙ্গে সমান হারে সেও যদি তাপ তৈরী করতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো—কারণ তখন তার শরীরের তাপযাত্রা হতো উনুনের আঁচের সমান!

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমাদের, অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে এই হার ০·০৩ ক্যালরি প্রতি গ্রামে প্রতি ঘণ্টায়, এবং সূর্যের তাপ উৎপাদনের হার প্রতি ঘণ্টায় নিজের প্রতি গ্রাম ওজনে মাত্র ০·০০০১৭ ক্যালরি!

* * * * *

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হবে

যাদু সম্রাট এ. সি. সরকারের

বিজ্ঞানের ভেলকি

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ঃ ফ্লোরেল

সুনীল সরকার

আগুন, আগুন আর আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছাই হয়ে যায় বাড়ীঘর, কলকারখানা। এমন কি, স্থলযান, জলযান, উড়ন্তযানও আগুনের লেলিহান শিখা থেকে মুক্তি পায় না। আর এতে শুধু বাড়ীঘর, কলকারখানা ও যানবাহনেরই ক্ষতি হয় না—মৃত্যু বরণ করেন অনেক অসহায় মানুষ এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয় জাতীয় সম্পত্তির।

আগুন আমাদের প্রয়োজন। আগুন নিয়ে আমরা খেলা করি, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। তথাপি কোন অসতর্ক মুহূর্তে আগুন আমাদের গ্রাস করে। তখন আমরা তাকে প্রতিহত করার জন্যে নানা পদ্ধতি গ্রহণ করি, যেমন আগুনের উপর জল ঢালি, কোন ভারি বস্তু বা বালি চাপা দিই। এ সবই প্রাচীন পদ্ধতি। অথচ বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে বসবাস করেও এর চেয়ে নতুন কোন পদ্ধতির কথা আমরা ভাবতে পারি না। অবশ্য এই পদ্ধতির একটা আধুনিক অথচ দ্রুত সম্পাদনের জন্য দমকল বাহিনীর প্রচলন করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণের জন্য দ্রুতগামী যান নিয়ে এরা সব সময় প্রস্তুত। নিজের জীবন বিপন্ন করেও দমকলবাহিনীর সেবকরা জাতীয় সম্পত্তি ও অসহায় পড়ন্ত মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন বা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এমন অনেক দৃশ্য আমরা দেখেছি। তোমরা ও হয়তো দেখেছো। আবার জল অভাবে অনেক বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—দমকল থাকা সত্ত্বেও এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়! আবার এমন অনেক মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ঘটে যে—যা পর্যাপ্ত জল দিয়েও নেভানো যায় নি, গেলেও তিন চারদিন সময় লাগে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

কিন্তু এসব তো গেলো স্থলের ব্যাপার। অন্তরীক্ষে যে সমস্ত উড়োযানে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আগুন ধরে যায় তা নেভানো কখনো সম্ভব হয় না। যাত্রীবাহী এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ এরূপ দুর্ঘটনায় হামেশাই পড়ছে এবং বিমানযাত্রী ও পাইলটসহ বিমানটি জ্বলন্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ছে মাটিতে। এভাবে প্রতি বছর, অগ্নি-কাণ্ডের ফলে কত বিমান যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, কত অসহায় মানুষ যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—সে করুণ চিত্র আমাদের অজানা নয়।

সম্প্রতি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মহাকাশযান ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে কৃত্রিম উপগ্রহ। এর মধ্যে মনুষ্যবাহী মহাকাশযানও আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে অভিকর্ষ ছাড়িয়ে ভিন গ্রহের অভিকর্ষের আকর্ষণে সেই গ্রহকে পরিক্রমা করে চলছে—নির্দিষ্ট কক্ষপথে।

সবই ঠিক আছে। সব ব্যবস্থাই পাকা আছে। তবু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ওই মহাকাশযানও বিকল হয়ে পড়ছে—এমন কি, আগুনও ধরে যাচ্ছে। তখন মহাকাশচারীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে, জ্বলন্ত মহাকাশ-যান সহ জীবন্ত মানুষগুলো মহাশূন্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিলো ইংরেজী 1967 সালের 27 ডিসেম্বর। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে অ্যাপোলো মহাকাশযান তিনজন মহাকাশচারী নিয়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিলো। নির্দিষ্ট গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছুবার অনেক আগেই সেই মহাকাশযানে আগুন ধরে গেলো! পৃথিবীতে বিপদ বার্তাটুকু পাঠিয়ে তাঁরা মহাশূন্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। মৃত্যু বরণ করলেন মহাকাশচারী আসম, এডোয়ার্ড হোয়াইট এবং রজার শাফে!

এই ঘটনায় আমেরিকাবাসীর সাথে ওই দেশের বিমান ও মহাকাশ সংস্থা গভীর শোক প্রকাশ করলেন। সেই সঙ্গে জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা মহাকাশচারীদের অমূল্য জীবন ও মহাকাশযানগুকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নতুন কিছু উদ্ভাবনে ব্রতী হলেন।

শুরু হলো গবেষণা।

ব্যাপক গবেষণা। জাতীয় মহাকাশ সংস্থার চাঁই চাঁই বিজ্ঞানীরা অগ্নি প্রতিরোধক উপাদান আবিষ্কারের জন্য দিনরাত্রি বিভোর হয়ে পড়লেন। যেমন করেই হোক বৈমানিক ও মহাকাশচারীদের বাঁচানোর উপাদান উদ্ভাবন করতেই হবে। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিরন্তর গবেবণা চালিয়ে অবশেষে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেন 'ফ্লোরেল' নামক একটি বস্তু। 1968 সালের মে মাসে টেকসাসের হিউস্টনে মনুষ্যবাহী মহাকাশকেন্দ্রে ওই বস্তুটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং এটি যে

যে অগ্নি প্রতিরোধ করতে সক্ষম তা তাঁরা ঘোষণা করেন।

এই প্রসঙ্গে মহাকাশ সংস্থার নিরাপত্তা বিভাগের ডিরেকটর ফিলিপ বলগার বলেছেন, দু রকমের ফ্লোরাইড দিয়ে এই বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে। কোন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সংগে সংগে এর তাপরোধক ক্ষমতা বেড়ে যায়। মিঃ বলগার আরো বলেছেন, অনেক সময় ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে নানা ত্রুটির ফলে আগুন ধরে যায়। ওই সকল তারের উপর 'ফ্লোরেল' এর প্রলেপ থাকলে আগুন ধরার আর কোন ভয় থাকবে না। এ ছাড়া বাস, ট্রাম, ট্রেনের কামরায়ও এর প্রলেপ লাগালে আগুনের কোন ভয় থাকবে না। নানা প্রকার বিমান, বিমানের কামরা, কম্পিউটার কারখানা, জেটচালিত বিমানে আগুন লাগবার ভয় সব সময়ই থাকে! এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে গেলে 'ফ্লোরেল'-এর আস্তরণ বা প্রলেপ লাগালে কোনও ভয়ই আর থাকবে না।

কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশযান-এর ভিতর ও বাইরে 'ফ্লোরেল'-এর প্রলেপ থাকলে আগুন ধরার কোন আশঙ্কাই অরে থাকবে না! এটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং সাফল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

'ফ্লোরেল' ফেনা, পেন্ট প্রভৃতি নানা আকারেই তৈরি হচ্ছে। এমন কি, 2200 ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ এবং আবহাওয়ায় শতকরা 100 ভাগ অক্সিজেন থাকলেও ফ্লোরেল'-এর আস্তরন যে কোন বস্তুকেই অগ্নির কবল থেকে রক্ষা করবে। সাধারণত আবহাওয়ায় শতকরা 20 ভাগ অক্সিজেন থাকে। ওই আবহাওয়ায় কাগজ 800 ডিগ্রী, চামড়া 850 ডিগ্রী, প্লাইউড 900 ডিগ্রী এবং ক্যানভাস 100 ডিগ্রী ফারেনহাইটে দগ্ধ হয়।

মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা এই বস্তুটি এখনো খোলা বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ছাড়েন নি। বিশেষ করে আমেরিকার বাইরে তো নয়ই। তবে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা নর্থ চার্লস্টনের জেনারেল অ্যাসবেস্টস এণ্ড রবার ডিভিশন রেবেস্টাস ম্যানহাটন কোম্পানীর কারখানায় এই অগ্নিরোধক অভিনব উপাদান বা বস্তুটি তৈরি হচ্ছে। এর বর্তমান নাম 'বেকমেণ্ট এল 3203-6'.

বর্তমানে এর দাম খুবই বেশি। ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হলে এবং ব্যবহার বেড়ে গেলে বস্তুটি সস্তায় পাওয়া যেতে পারে।

মায়া নিলয়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ঃ শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। সি, জি, এস, পদ্ধতিতে শক্তির এককের নাম কি?
২। P. V. C. কথার অর্থ কি?
৩। মাইক্রোসকোপ যন্ত্রের আবিষ্কর্তার নাম কি?
৪। গণিত শাস্ত্রের উপর 'Elements' নামক তেরো খণ্ড গ্রন্থের রচয়িতা কে?
৫। 'লাংফিশ' শ্রেণীর মাছেরা কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত?
৬। ক্যালসিয়াম-এর কোন্ কার্বনেট যৌগ সুন্দর স্ফটিক রূপে পাওয়া যায়?
৭। এনজাইমের প্রোটিন অংশকে কি বলা হয়?
৮। 'ক্রেস্‌কোগ্রাফ' যন্ত্রের আবিষ্কর্তার নাম কি?
৯। বারুদের কোন্ উপাদানটিকে উত্তপ্ত করলে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়?
১০। কোন্ বৈজ্ঞানিক হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন?
১১। যে উদ্ভিদ-দেহ থেকে কর্পূর পাওয়া যায় তার নাম কি?
১২। ডাচ-মেটাল (Dutch metal) জিনিসটা কি?

(সমাধান থাকবে পরবর্তী সংখ্যায়)

বৈশাখ সংখ্যার সমাধান

১। 'টাইকো ব্রাহে' ডেনমার্ক দেশীয় এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন।
২। বিছুটি পাতার শুঁয়াগুলি দেহচর্মের ভিতরে প্রবেশ ক'রে অল্প পরিমাণ ফরমিক অ্যাসিড ঢেলে দেয় বলে গা জ্বালা করে।
৩। অ্যামোনিয়া গ্যাস ক্ষারধর্মী।
৪। 50°C উষ্ণতার নীচে সালফার-এর 'রম্বিক' রূপ-ভেদটি স্থায়ী।
৫। সকল শ্রেণীর শর্করার মধ্যে 'ফ্রাক্টোজ' বেশী মিষ্টি।
৬। আকরিককে সহজে গলাবার জন্যে যে সব পদার্থ ব্যবহৃত হয়, রসায়নের ভাষায় তাদের সাধারণ নাম ফ্লাক্স (Flux) বা বিগালক।
৭। ভিটামিন-সি এর অপর নাম 'অ্যাসকরবিক অ্যাসিড'।
৮। বৃহত্তম মাছের নাম 'RHINODON.'
৯। কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে যে শিলার নাম রাখা হয়েছে তা হলো—'CHARNOCKITE'
১০। অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ 'RUBY' রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
১১। কঠিনতম খনিজ পদার্থের নাম 'হীরক'।
১২। মানব দেহের বৃহত্তম গ্রন্থির নাম 'HEPAR.'

অজানা মহাকাশে
২০
গ্রহে স্বাগত জানাই। যান ছেড়ে বেরিয়ে এসো, কথা দিচ্ছি তোমাদের কোন ক্ষতি করা হবেনা।
এসো—এসে আমাদের ধরো
২১
যানটা উড়িয়ে দাও। অভিযাত্রীদের উপর পক্ষাঘাত - অস্ত্র প্রয়োগ করো।
ওরা ভেতরে ঢুকলেই উপযুক্ত আপ্যায়ন করছি
তৈরী থাকো - ওরা প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েছে।
২৩
কিন্তু ক্রেন ও তার সঙ্গীরা সেই আক্রমণের মুখে দাঁড়াতেই পারলো না
২৪
আমার ফোটন - ব্লাস্টার কাজ করছে না
২৫
কাউকে মেরো না! ওদের জ্যান্ত চাই।
সনিক পক্ষাঘাত অস্ত্র ব্যবহার করো

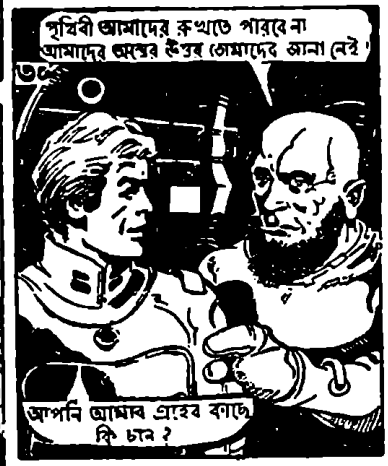

২৭
মহামহিম, এই হলো পৃথিবীর যানের অভিযাত্রীরা।
ঐ শেষ জনকে নিয়ে এসো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই
২৮
ওরা লড়ে হেরেছে....ওদের নেতা এখন বাকি সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।
২৯
আমার নাম কাল। ক্যালিস গ্রহের নেতা। পৃথিবী বাসী, এবার আমি তোমাদের গ্রহকে ধ্বংস করবো।
আমার তা মনে হয় না!
৩০
পৃথিবী আমাদের রুখতে পারবে না আমাদের অস্ত্রের উত্তর তোমাদের জানা নেই।
আপনি আমার গ্রহের কাছে কি চান?
আমি খবর চাই। আর সেই খবর দেবে তুমি।
খবরের বিনিময়ে তোমাকে আমি প্রাণে বাঁচাবো
আমাকে মেরে ফেললে কোন খবরই আপনি পাবেন না
তা ঠিক, তবে অবাধ্য লোকেদের কাছ থেকে খবর আদায়ের অনেক ওষুধ আছে। এসো, তা তোমাকে দেখাই
৩১
তোমাদের যান দু-দুবার আমাদের মহাকাশ এলাকায় প্রবেশ করেছে
আপনি পাগল। যা করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন, সে সবের কোন মানে হয় না
৩২
ওরা কালের হোভার-মোবাইলে চড়ে বসলো।
৩৩
আমরা এক অভিযাত্রী ক্যাপসুলের খোঁজে শান্তিপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছি
কিন্তু সেটাই আমাদের পক্ষে ভয়ের কারণ। পৃথিবীকে ধ্বংস করতেই হবে
এক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ বিভাগের সামনে এসে হোভার-মোবাইল থামলো।
৩৪
এখানেই আমরা নেগেটিভ ফিল্ড জেনারেটর তৈরী করি। তোমরা এর মোকাবিলা করার উত্তর জানো না।

সবুজ দ্বীপের রহস্য

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আজকের কথা নয়, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ফিরে যাচ্ছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও শুরু হয় নি; জার্মেনীতে তখন হিটলার সাহেবের প্রবল প্রতাপ।

এখন যেমন লোকে কথায় কথায় ইয়োরোপ বা আমেরিকায় পাড়ি দেয় তখন তার রেওয়াজ ছিল না। তবুও আমার ছাত্রজীবনটা জার্মেনীতেই কেটেছিল। আমার ছোট মামা তাঁর গোটা জীবনটাই ওদেশে কাটিয়ে গেছেন। তিনিই জোর করে বাবাকে বলে আমাকে ওখানে পড়াতে নিয়ে যান। কত বছর আগেকার কথা, এখনও সে দিন-গুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে!

ইস্কুল থেকেই জার্মেনীতে কাটাবার ফলে ওদেশের ভাষাটা ভালো রকমই শিখেছিলাম। যখন বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন বিষয় নির্বাচন নিয়ে একটু সমস্যা বাধল। বাবা, ছোট মামা—সকলেরই ইচ্ছা আমি এঞ্জিনীয়ারিং বা ঐ রকম কোন টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হই। আমার কিন্তু ওসব তেমন ভালো লাগত না। আমার মধ্যে বোধ হয় একটা কবি-মন লুকিয়েছিল, সেটাই মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। আমার ভালো লাগত উদার প্রকৃতি আর তার ইতিহাস। না, এখনকার রাজারাজড়াদের ইতিহাস নয়,—সেই প্রকৃতির ইতিহাস। এই পৃথিবী, গাছপালা, জীব-জন্তু,—বিশেষ করে মানুষ কি করে এল তারই ইতিহাস। সুযোগ পেলেই তাই আমি এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়তাম। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক। এমন কি নরওয়ে সুইডেনও।

এ সব ব্যাপারে আমার সঙ্গী ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী ভিল্‌হেল্‌ম্ স্মিট্। ভিল্‌হেল্‌ম্ এখন অবিশ্যি পেশায় ডাক্তার। তবে সাধারণ ডাক্তার নয়, বোবা-কালা—ভালো বাংলায় তোমরা যাদেরকে বল মূক বধির,—ও তাদেরই ডাক্তার। কিন্তু সেই ছেলেবেলাকার স্বভাবটা ওর এখনও রয়ে গেছে। সময় পেলেই আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়তাম। অবিশ্যি ওর ছুটি কম, আর সে তুলনায় আমার ছুটি অনেক বেশি। কারণ ছাত্রজীবন শেষ করে আমি এখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছিলাম।

বেশ মনে পড়ে সেদিনটা ছিল রবিবার। সন্ধ্যার পর আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে একটা নতুন-কেনা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। তারের ওপার থেকে ভেসে এল ভিল্‌হেল্‌মের কণ্ঠস্বর।—"আশুখ, কি করছিস? কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে চাস?"

আমার নাম অশোক, ওখানকার জার্মান্ উচ্চারণে আমি আশুখ্ হয়ে গেছি আর তাই মেনে নিতে হয়েছে। আগ্রহের সঙ্গে বললাম, "নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?"

ভিল্‌হেল্‌ম্ জানাল, একটা ডাক্তারী 'কল' নিয়ে তাকে কয়েক দিনের জন্য জার্মেনীর বাইরে যেতে হচ্ছে। 'কল' বটে, তবে তার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে, নর্থ সী-তে এদিক-ওদিকে খুব ছোট ছোট কতকগুলি দ্বীপ আছে, তার একটাতে কিছু যাযাবর জাতের লোক এসে ডেরা বেঁধেছে। এরা ঠিক জিপ্‌সী নয়, কিন্তু চালচলনে বোধহয় অনেকটা তাদেরই মত। তবে এরা লোকালয়ে আসতে চায় না, কারণ এদের মধ্যে প্রায় সকলেই বোবা আর কালা। সভ্য সমাজে মিশতে তাই এদের অসুবিধা হয়। কিন্তু বোবা-কালা হলেও অসুখের হাত থেকে তো কারো নিস্তার নেই। সম্প্রতি এদের মধ্যে কি একটা নতুন রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে। আর, মুশকিল হচ্ছে, ওদের নিজেদের মধ্যে সত্যিকার চিকিৎসক কেউ নেই। যারা আছে তারা কতকটা সেই ওঝা গোছের—তুকতাক, শিকড়বাকড় দিয়ে

রোগ সারাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তো সত্যিকার রোগ সারে না! তাই ওরা ভিল্‌হেল্‌মের কাছে একজন লোক পাঠিয়েছে—ওকে 'কল' দিয়ে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে যেতে যায় চিকিৎসা করাতে।

"লোকটাকে চিনিস তুই?"—আমি জিজ্ঞাসা করি।

"চিনতাম না, সম্প্রতি আমাদের হাসপাতালে আলাপ হয়েছে। নাম হান্স রিগেল। এ লোকটিও বোবা এবং কালা, তবে অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখেছে। লিখে লিখে মনের কথা জানাতে পারে। তা ছাড়া আমি তো ওদেরই ডাক্তার, তাই ইশারায়-ইঙ্গিতে ওদের সঙ্গে আলাপ চালাতে আমার কোন কষ্ট হয় না। আমি যাব বলে কথা দিয়েছি। হল্যাণ্ড হয়ে যাব। দিন তিন-চারের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। তবে যেতে হবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। যাবার ব্যবস্থা রিগেলই করবে। একা একা যাব, তাই ভাবছি তোকে সঙ্গী পেলে ভালো হ'ত। অবশ্য রিগেলও আমাদের সঙ্গে যাবে। তুই রাজী হোস তো তৈরি হয়ে নে। কাল খুব ভোরেই আমরা যাত্রা করব।"

বাইরে ঘুরে আসবার জন্য যে সব ছোটখাট সরঞ্জাম লাগে সেগুলো আমার ব্যাগে গোছানোই থাকে। কাজেই চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নিতে অসুবিধা কিছু নেই।

খুব ভোরেই রওনা হলাম। প্রথমটা মোটরে আমস্টার-ডাম্। সেখান থেকে ছোট্ট একটা সমুদ্রগামী লঞ্চে তোলা হ'ল আমাদের। ছোট্ট লঞ্চ, সম্ভবতঃ চার্টার করা। পাঁচ-সাতজন মাত্র ক্রু বা সারেং। আর যাত্রী বলতে আমরা তিনজন—ভিল্‌হেল্‌ম্, আমি আর রিগেল।

রিগেলের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কিন্তু কথাবার্তা বেশি কিছু বলা গেল না, কেননা আকারে ইঙ্গিতে আর কত কথা বলা যায়? তা ছাড়া আমি তো ভিল্‌হেল্‌মের মত মূকবধির বিশেষজ্ঞ নই! তবে রিগেলের সেদিনকার চেহারাটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কবি কালিদাস তাঁর একটি কাব্যে নায়কের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—"বৃষোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ।" অর্থাৎ বিশাল বুক, ষাঁড়ের মত ঘাড়, শাল গাছের মত দীর্ঘ আর হাত দু'টো মস্ত লম্বা। রিগেলও যেন কতকটা সেই রকম। বিশাল বক্ষদেশ, ঘাড়টা যেন মাথার সঙ্গে মিশে গেছে—চলতি কথায় যাকে আমরা বলি ঘাড়ে-গর্দানে এক। সত্যি বলতে ওর মাথা আর ধড়ের মধ্যে ঘাড় বলে কিছু আছে বলে মনে হ'ল না! হাত দু'টোও অস্বাভাবিক বড়। মানুষটাও খুব লম্বা, কিন্তু কেমন একটু কুঁজো, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ফলে হাত দু'টো ঝুলিয়ে দিলে হাঁটু ছাড়িয়েও অনেকটা নীচে নেমে যায়। মুখের গড়নটাও প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে, কারণ চোয়ালের হাড়টা এত বড় যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি মানুষের মুখ থেকে একটা ঘোড়ার চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মাথার পেছন দিকটা বেশ পুষ্ট, সেই তুলনায় কপালটা ছোট্ট এক রত্তি আর তার ঠিক ওপরেই আফ্রিকার নিগ্রোদের মত ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়ানো চুল;—যেন কপাল শেষ হতে না হতেই গজাতে শুরু করেছে। রিগেল অবিশ্যি মাঝখানে চেরা সিঁথি টেনে তা যতটা সম্ভব বাগে আনার চেষ্টা করেছে কিন্তু তবু সে চুল তেমন সুবিন্যস্ত হতে পারে নি। কানের পাশ থেকে, ওপর থেকেও চুল বেরিয়েছে আর বেরিয়েছে ভুরু থেকে। উঃ, কী মোটা লোমশ ভুরু! লোকটা বোধহয় বেশ লোমশ। অবিশ্যি প্যাণ্ট-কোটের নীচে ঢাকা পড়ায় হাতের কব্জি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সেখানেও আমাদের তুলনায় লোম যেন বড় বেশি গজিয়েছে। অবিশ্যি এরকম লোমশ লোক অন্যত্রও অনেক দেখেছি।

লঞ্চ সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঢেউ কেটে চলেছে, আশ-পাশে মাঝে মাঝে দু'-একটা ডুবো পাহাড় চোখে পড়ছে, তাই সাবধানে চালাতে হচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই রিগেল জানাল আমরা গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

সত্যিই তাই। মাথার ওপর কয়েকটা সাদা সাদা সী-গাল্ পাখিকে উড়তে দেখেই বোঝা গেল কাছাকাছি কোথাও ডাঙ্গা রয়েছে।

হঠাৎ আমাদের লঞ্চ একটা খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবার দু'পাশেই অনুচ্চ পাহাড়, মাঝখানে ছোট্ট একটা জলপথ; তারই মধ্যে দিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। ক্রমে পাহাড়ও কমে এল, ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিতে লাগল সমুদ্রের বেলাভূমি। তার পাশে ঝাউবন। একেবারে সবুজের সমারোহ। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের ডেক-এ কি যেন একটা উড়ে এসে পড়ল। প্রথমে একটা, তার পর আর একটা, তার পর একসঙ্গে গোটা দু-তিন। আরে, এ যে দেখছি বড় বড় মাছ! কিন্তু মাছের কি পাখির মত উড়বার ডানা থাকে? হ্যাঁ, থাকে, উড়ুক্কু মাছের থাকে। এদের পিঠের দু'টি ডানা পাখির ডানার মত ছড়ানো। তাই বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে এরা ২০।৩০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে এসে পড়েছে লঞ্চের ডেক-এ। আচমকা মাছ দেখে খুশি হয়ে সেটা তুলে নিতে গেল একজন সারেং, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মত একটা দড়ির ফাঁস এসে পড়ল মাছের গায়ে আর, ঠিক যেমন করে ল্যাসো দিয়ে; বুনো

জন্তুর গায়ে ফাঁস লাগিয়ে টেনে দেওয়া হয়, তেমনি করে কে যেন মাছটাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে চলল উড়ুক্কু মাছের ডানা ঝট-পটানো আর সড়াৎ সড়াৎ ল্যাসোর শব্দ। আমাদের চোখের সামনে মুহূর্তে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল মাছগুলো।

কারা ছুঁড়ছে এই ল্যাসো? গাছের আড়ালে লোক-গুলোকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যারাই ছুঁড়ুক এ বিদ্যায় যে তারা খুবই সুপটু তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

একটু পরেই লঞ্চ এসে পাড়ের কাছে ভিড়ল। লঞ্চ থেকে একটা লম্বা পাটাতন ফেলে দেওয়া হ'ল ডাঙ্গায়, তার ওপর দিয়ে আমরা তিনজন নেমে এলাম। রিগেল সারেংদের ইশারায় কি সব বুঝিয়ে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল।

আগেই বলেছি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ এই রিগেল। কিন্তু এখন মনে হ'ল চেহারাটা কেমন একটু বেঢপ। অত লম্বা কিন্তু সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চলছে। লম্বা হাত দু'টো প্রায় মাটিতে ঠেকে আর কি! কিন্তু চলতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। আমরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছিলাম না। মুহূর্তে মুহূর্তে ও আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই বারে বারে ওকে থামতে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আমরা যে ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনের জিনিস লক্ষ করি সে ভাবে ও আমাদের দেখছিল না, দেখবার সময় সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

খুব বেশিক্ষণ কিন্তু হাঁটতে হ'ল না। একটু এগিয়েই দেখা গেল একটা জায়গায় অনেকগুলো নারকেলগাছ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রামের মত। অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি সবই কাঠকুটো কেটে আর জুড়ে জুড়ে তৈরি করা হয়েছে। অনেকটা টেন্ট্ বা তাঁবুর মত, কিন্তু তার চাইতে বড়। কোন কোন বাড়িতে তিন-চারটে করে ঘর আছে বলেও মনে হ'ল।

রিগেল আমাদের নিয়ে একটা বাড়ির বসবার ঘরে বসাল।

ঘরের আসবাবপত্র অতি সাধারণ, বেশির ভাগই কাঠ-কাটরা কেটে তৈরি। ঘরে বসে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছি এমন সময় একজন লোক দু'টি পাত্র আর দু'টি গেলাস এনে সামনে রাখল। বুঝলাম আমাদের এবার একটু জলযোগ দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে। কিন্তু খাবারের চেহারা দেখে হকচকিয়ে যেতে হ'ল। বেশ খানিকটা নারকেলের শাঁস, তার পাশে রাঙা আলু জাতের কোন কন্দ জাতীয় পদার্থ। অবশ্য সেটা আগুনে একটু ঝলসে নেওয়া হয়েছে। আর তার পাশে মনে হ'ল খুব মিহি করে কাটা কোন কচি কচি গাছের পাতা—তবে হয়তো কোন শাকও হতে পারে। কিন্তু কাঁচা। গেলাসের মধ্যে খানিকটা করে টকটকে লাল তরল পদার্থ, হঠাৎ দেখলে তাজা রক্ত বলে ভুল হয়।

ভিল্‌হেল্‌ম্ নারকেলের শাঁসগুলো অবলীলাক্রমে চিবুতে চিবুতে গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু থম্‌কে গেল। রিগেল ইশারায় জানাল, "খেয়ে নিন, খুব সুস্বাদু পানীয়।" একটু ইতস্ততঃ করে ভিল্‌হেল্‌ম্ একটা লম্বা চুমুক দিতেই তার মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠল। কোন রকমে উগরে আসা পানীয়টুকু সামলে নিয়ে সে গেলাসটা পাশে রেখে দিল। ব্যাপার দেখে আমি আর ও-পথে গেলাম না। আচম্‌কা বিষম খাবার ভান নিয়ে ওটা নামিয়ে রাখলাম।

ইতিমধ্যে সেই পরিবেশক আর একটা পাত্রে কি যেন নিয়ে এসেছে। তার পাশে একটা ছোট হাতুড়ী। চেয়ে দেখি বেশ কয়েকটা মোটা মোটা মাছের হাড়। তার গায়ে মাংসটাংস কিছু নেই—পরিষ্কার করে চাঁছা। আমাদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে রিগেলই খুশির ভঙ্গিতে একটা হাড় তুলে নিল, তারপর হাতুড়ী দিয়ে থেঁৎলে তার ভিতরকার মজ্জাটুকু চুষে খেয়ে ফেলল। আমরা তো 'থ'। এ কাদের মধ্যে এসে পড়লাম রে বাবা!

ভিল্‌হেল্‌ম্ ইঙ্গিতে জানাল, খাওয়া পরে হবে, এবার রোগী দেখে আসা যাক। সেই জন্যই তো এখানে আসা। আমি কি করব ভাবছি, ভিল্‌হেল্‌ম্ আমাকে একা ফেলে না রেখে হাত ধরে টেনে নিল, রিগেলকে ইশারায় জানাল, "ও-ও সঙ্গে যাবে, ও আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।"

রোগীদের দেখলাম। একজন নয়, পাশাপাশি কয়েকটি খাটিয়ায় তিন-চারজন রোগী শুয়েছিল। মনে হ'ল বেশ কষ্ট পাচ্ছে তারা। তাদের ঘিরে কয়েকটি মেয়ে, বোধহয় শুশ্রূষা করার জন্যই বসে আছে। কিন্তু মেয়ে হলেও তাদের চেহারায় নারীসুলভ লাবণ্যের একান্তই অভাব। এমন কেঠো-চেহারার মেয়ে আর কখনও কোথাও দেখি নি। অবিশ্যি সকলেই বেশ আঁটসাঁট মেয়েলি পোশাক পরেই বসে ছিল, কেউ কেউ পাখা নিয়ে রোগীদের বাতাসও করছিল। কিন্তু দেখলাম মেয়েরাও সবাই বোবা-কালা, পরস্পরের সঙ্গে ইশারা-ইঙ্গিতেই কথাবার্তা চালাচ্ছে।

ভিল্‌হেল্‌ম্ ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতি বার করে এক এক করে রোগীদের পরীক্ষা করে চলেছে। আমি ইত্যবসরে

ঘরের চারদিক আর ঘরের বাসিন্দাদের খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি। দেয়ালে কয়েকটা হুকের মধ্যে লম্বা লম্বা কিছু দড়ি ঝোলানো, সেগুলোর মুখের দিকটায় ফাঁস বাঁধা— ঠিক যেমনধারা ল্যাসো দিয়ে সকালে উড়ুক্কু মাছগুলো ধরা হয়েছিল ঠিক সেই রকম। তবে কি এরাই সেই মৎস্যশিকারী আর সেই মাছেরই হাড় দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করল ওরা ?

ভিল্‌হেল্‌ম স্টেথেস্‌কোপ্ দিয়ে প্রথম রোগীটিকে পরীক্ষা করার সময় তার জামার বোতাম খুলে ফেলল। দেখলাম রিগেলের মত এরও বুক লোমে ভর্তি। ভিল্‌হেল্‌ম তাকে জিভ দেখাতে বলল। সে হাঁ করতেই মুখের মধ্যে টর্চ ফেলল এবং ফেলেই কেমন যেন চমকে উঠল। একবার আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলি বলি করেও বলল না।

কিন্তু খাবারের চেহারা দেখে হকচকিয়ে যেতে হোলো।...

দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার ঘরের বাসিন্দাদের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য, ঘরে এতগুলো লোক কিন্তু কেউ কথা বলতে পারে না। অবশ্য মনের ভাব আদান-প্রদানের কমতি নেই। ইশারায়-ইঙ্গিতে সবাই অনর্গল কথা বলে চলেছে। বিশেষ করে মেয়েরা। আবার মজা, যখন ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে চলাফেরা করছে সকলেই কুঁজো হয়ে চলছে, ঘাড় উঁচু করে খাড়া দাঁড়াবার চেষ্টা করছে না কেউ। অবিশ্যি ঘাড় থাকলে তো উঁচু করবে!

তারপর একইভাবে সব ক'টি রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যাগ খুলে ইন্‌জেকশনের ছুঁচ বার করল। প্রত্যেককেই একটা করে ইন্‌জেকশন দিল। তারপর একটা শিশি বার করে সামনের মেয়েটির হাতে দিয়ে তাকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল কখন কি ভাবে খাওয়াতে হবে।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ভিল্‌হেল্‌ম বলল, "আরও ঘণ্টা পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে হবে রোগীদের ওপর ওষুধের ক্রিয়া হচ্ছে কিনা দেখতে। মনে হচ্ছে, সকলেরই ম্যালেরিয়া গোছের কিছু হয়েছে। ততক্ষণ না হয় দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখা যাক।"

বাইরে বেরিয়ে এলাম। বলা বাহুল্য রিগেলও আমাদের সঙ্গী হ'ল। আরও দু'টি লোক সঙ্গে চলল।

দ্বীপে চাষবাসের তেমন কোন ব্যবস্থা আছে বলে মনে হ'ল না। কিন্তু যতই ভিতরের দিকে যেতে লাগলাম—চোখে পড়ল অগুণতি গাছ, এবং তার অনেকগুলিতেই নানারকম বুনো ফল ঝুলছে যা দেখা দূরে থাক, যার নামও আমরা কখনও শুনি নি। আর আছে অজস্র নারকেল গাছ। এইসব ফলন্ত গাছের সমারোহে সারা দ্বীপটাতেই যেন একটা ঢালা সবুজের রঙ খেলে যাচ্ছিল। কি নাম দ্বীপটার? কি জানি, ওরা কোনও নাম দিয়েছে কিনা! আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা নাম ঠিক করে ফেললাম—সবুজদ্বীপ। ভিল্‌হেল্‌মকে বলতে সেও তারিফ করল নামটার।

হঠাৎ একটা গুড় গুড় শব্দে দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা এরোপ্লেন দূর আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে—শব্দটা তারই, রিগেল কিংবা তার সঙ্গীরা যে সে শব্দের কোন আভাস পেয়েছে এমন মনে হ'ল না। পরক্ষণেই মনে হ'ল কেমন করে পাবে, ওরা তো কালা! কিন্তু আমাদের দু'জনকেই ওপরের দিকে তাকাতে দেখে ওরা কি ভাবল কে জানে, তিনজনই মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ প্লেনটার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে লাগল।

ঘণ্টা পাঁচ-ছয় বেড়িয়ে ফিরে এসে শুনলাম ওষুধে দারুণ কাজ হয়েছে। রোগীরা সকলেই অনেকটা সুস্থ হয়ে ঘুমুচ্ছে। ভিল্‌হেল্‌ম্ আরও কিছু ওষুধ ব্যাগ থেকে বার করে দিয়ে মূক বধিরের ভাষায় নানা উপদেশ দিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরী হ'ল। ওরা কিন্তু আরও একবার না খাইয়ে ছাড়ল না। এবারকার খাদ্য তালিকাও প্রায় একই রকমের। তবে এবার সঙ্গে কিছু অজানা ফল-ফলারিও ছিল। বুনো হলেও খেতে মন্দ লাগল না। সবশেষে এল আবার সেই লাল তরল পানীয়। কিন্তু এখন যেন সেটা ওবেলার মত অত ঘন লাল নয়,—কেমন একটু কালচে লাল। আমরা ওটা খেতে চাইছি না বুঝে ওরা দু'টো বোতলে সেগুলো ঢেলে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিল—পরে খাবার জন্য। ভাবখানা, এত উপাদেয় পানীয় না চেখে গেলে ওদের অতিথি সৎকারে ত্রুটি থেকে যাবে।

আবার জার্মেনীতে নিজেদের শহরে ফিরে এলাম। পথে ভিল্‌হেল্‌মকে মনে হ'ল কেমন যেন চিন্তিত! কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলল, না, কিছু না। কিন্তু পরদিনই ও আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বলল, "জানিস আশুখ-কাল থেকে একটা কথা যত ভাবছি ততই অবাক্ লাগছে। একটা দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা—মেয়েপুরুষ সবাই বোবা, কালা আবার কুঁজো। চাল চলনে, আচার নিয়মেও আমাদের সঙ্গে একদম মেলে না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

ভিল্‌হেল্‌ম্ বলল, "শুধু তাই নয়, জানিস আশুখ্, আমি যখন প্রথম রোগীটিকে হাঁ করতে বললাম তখন কি দেখলাম জানিস। ওর জিভটা ছোট্ট একরত্তি, আর এমন ভাবে মুখের সঙ্গে সাঁটা যে ও জিভ দিয়ে খাওয়া গেলেও কোন শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, ওর মুখে আমাদের মত ক্যানাইন টীথ অর্থাৎ কুকুরে দাঁতও নেই। শুধু প্রথম রোগীটি নয়, প্রত্যেকটি রোগীর বেলাই এই এক ব্যাপার। জানিস তো এই ক্যানাইন টীথ্ হচ্ছে মাংসাশী প্রাণীর একটা বিশেষত্ব। আমাদের সকলেরই মুখে চার রকমের দাঁত আছে—কষের দাঁত মোলরে, প্রিমোলার, কাটুনে দাঁত ইন্‌সিসর আর কুকুরে দাঁত ক্যানাইন—যা দিয়ে মাংস চিবুনো যায়। নিরামিষাশী প্রাণীদের এই ক্যানাইন টীথ্ থাকে না বলে তারা মাংস দিলেও খেতে পারে না।"

এসব আমি অবশ্য আগেই জানতাম, তবু ভিল্‌হেল্‌মের ব্যাখ্যায় বাধা দিলাম না।

ভিলহেল্‌ম্ আবার বলল. "ওদের কারোই ক্যানাইন টীথ নেই বলে ওরা বাধ্য হয়েই ফলমূল, কন্দ, শাকপাতা এইসব খায়। আমাদেরও তাই খেতে দিয়েছিল। তবে মাংস চিবুতে না পারলেও আমিষের দিকেও ওদের কিছুটা লোভ আছে। যে লাল পানীয়টা আমাদের খেতে দিয়েছিল এবং প্রথম বার আমি এক চুমুক খেয়েওছিলাম সেটা তাজা রক্ত ছাড়া আর কিছুই না। আমার মনে হয় ওটা সেই উড়ুক্কু মাছেরই রক্ত। বিকেলের দিকে সে রক্ত আর তেমন তাজা ছিল না—কালচে হয়ে আসছিল! রক্তের নিয়মই তো তাই। পরে আরও জমাট বেঁধে যায়। ওরা বোতলে সে রক্ত ভরে খাতির করে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। আমি সে রক্ত খাই নি তবে মাইক্রস্‌কোপে পরীক্ষা করে দেখেছি তা রক্ত ছাড়া কিছু নয়, আর মাছেরই রক্ত। আবার চিবুতে না পারলেও হাতুড়ী দিয়ে হাড় ফাটিয়ে তার মজ্জাটা রিগেল কেমন আয়েস করে খেয়েছিল দেখেছিলি তো?"

এ রকম একটা সন্দেহ আমারও হয়েছিল কিন্তু তার চেয়েও বড় যে সন্দেহটা হয়েছিল সেটা আর তখন ভিলহেল্‌মকে বলি নি।

আমি অ্যানথ্রপলজি অর্থাৎ নৃতত্ত্বের অধ্যাপক।

মানুষের নানা ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আমাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। তার মধ্যে মানুষের ক্রমবিকাশও একটি। সন্দেহটা হয়েছিল সেইজন্যই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের শুধু সন্দেহ থেকেই কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ নয়। তাই এখানে এসেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে জোর তথ্যতল্লাসী শুরু করে দিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে নানা রকম প্রাগৈতিহাসিক জাতের মানুষের ফসিল সংগ্রহ করা আছে। তা নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে, আমিও কিছু কিছু করেছি। আমি ও-নিয়ে আবার জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম, এবং শেষে যখন স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, তখনই কেবল ভিল্‌হেল্‌মকে জানালাম কথাটা।

ওরা কতকটা মানুষের মত দেখতে হলেও আসলে ওরা মানুষ নয়।

ভিল্‌হেলম্‌ শুনে আকাশ থেকে পড়ল। "তার মানে? কি বলতে চাস তুই?"

"ওরা মানুষেরই একটা প্রজাতি—যারা নাকি তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে জার্মেনীরই একাংশে, এখন যাকে বলা হয় ডুসেলডর্ফ, তারই আশপাশে বাস করত। জায়গাটার আসল নাম নিয়ান্‌ডার্থাল, তাই বিজ্ঞানীরা ওদের নাম দিয়েছেন নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান্‌।"

"নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান্‌! সে কি! তারা তো তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, আমরাও তো সবাই তাই জানি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে কত বিস্ময় যে এখনও আমাদের জন্য জমা রয়েছে সেইটুকুই জানি না। এরা যে এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি, সামান্য কিছু,—হয়তো সংখ্যায় মাত্র শ'খানেক কি তারও কম, কালের নিয়মকে কলা দেখিয়ে এখনও টিকে আছে এই কথাটাই আমি জোর দিয়ে বলতে চাই। এ যুগের সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে, তাদের রীতিনীতি অনুসরণ করে চালচলনে এরাও কিছুটা সুসভ্য হয়ে উঠেছে।"

"কি বলতে চাস তুই, ভালো করে বল!" উত্তেজনায় ভিল্‌হেল্‌ম্‌ তখন দস্তুর মত কাঁপছে।

"যা বলতে চাই তুই তো আগেই তার কিছু কিছু বলেছিস। নিয়ান্‌ডার্থাল ম্যান্‌রা সত্যিকার মানুষ ছিল না, বড় জোর ওদের উপমানুষ বা প্রায়-মানুষ বলা যেতে পারে। ওরা যে পুরোপুরি নিরামিষাশী ছিল তা ওদের দাঁতের ফসিল দেখেই জানা গেছে। দাঁতের সেই চেহারা এখনও বদলায় নি, ক্যানাইন টীথ্‌ও গজায় নি। আরও শোন, তাদের চোয়াল ছিল লম্বা—সামনের দিকে ঘোড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে আসা সে চোয়ালও তাদের এখনও রয়ে গেছে। মাথা আর ধড়ের মধ্যে ঘাড় বলে পৃথক কিছুর অস্তিত্ব বড় একটা ছিল না। এখনও তাই দেখছি। এইজন্যই ওরা ঘাড় বাঁকাতে পারত না, এবং ঘাড়ের ঐ রকম গড়নের জন্য আকাশের দিকে তাকাতে হয় শুয়ে। শুয়ে না পড়ে আকাশ দেখার উপায় ছিল না তাদের। এখনও সেই রকম করেই আকাশ দেখতে হয়। ওদের মগজ ছিল মাথার অনেকটা পেছন দিকে, তাই মাথার দিকটাই হত বেশি পুষ্ট। সেই তুলনায় মাথার সামনের দিকটা ছিল ছোট। নীচু হয়ে এলে যা হয়। ঐ কারণেই কপালটাও ছিল এক রত্তি।"

ভিল্‌হেলম্‌ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে আমার কথাগুলি যেন গিলছিল। আমি ফের বলে চললাম, "মাথা আর ঘাড়ের গড়ন এমনি হওয়ায় ওরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। কুঁজো হয়ে, অনেকটা ওরাং-ওটানের মত হাঁটতে হ'ত ওদের। আর সেইজন্যই হাত দু'টো ছিল লম্বা,—যাতে দরকার হলে মাটিতে হাতের ভর দিয়েও চলতে পারা যায়। গরিলারা তো এখনও ঐভাবেই চলে। অবশ্য ক্রমবিকাশের ফলে ওদেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে। হাত দু'টো হয়তো আর একটু ছোট হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের তুলনায় তা আজানুলম্বিত নয়—আগুল্‌ফ-লম্বিত। হাঁটু নয়, ঝুলিয়ে দিলে গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। আর জিভের কথা? সে তো তুই নিজের চোখেই দেখেছিস! ও জিভ দিয়ে কথা বলা যেত না, এখনও যায় না। তাই এখনও ওরা সবাই বোবা এবং বোবা হলেই যে কালাও হতেই হবে এ কথা তো তোর মত মূক-বধিরদের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বলে দিতে হবে না!"

ভিল্‌হেলম্‌ খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত থেকে বলল, "তুই অবাক্‌ করলি আশুখ্‌! এ কথাও কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"যা সত্যি তা বিশ্বাস না করে উপায় কি ভাই? এই রকম অবাক করা কত কীই তো পৃথিবীতে রয়ে গেছে। আমরা খবর রাখি না, তাই অবাক্‌ হই। মানুষের যে পৃথক একটা প্রজাতি—যাকে তোরা বলিস 'স্পিসিস্‌' বহু হাজার বছর আগে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা জানতাম তাদেরই সামান্য কিছু ভগ্নাংশ যদি এখনও কালের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে থাকে তবে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আফ্রিকার বুশ্‌ম্যান, আন্দামানের জারোয়া, জাপানের আইপু—এরা

কিছু পরবর্তী কালের মানুষ হলেও এখনও তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি! আর বলতেকি, সত্যকার মানুষের সঙ্গে এদেরও তফাৎটা বড় কম নয়! অবিশ্যি নিয়ানডার্থল ম্যানরা আরও পুরোনো যুগের। কিন্তু সেই পঞ্চাশ হাজার বছর আগেও তো তারা সে যুগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। তারা আগুনের ব্যবহার জানত, পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল—এ সব তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। সত্যিকার মানুষ পৃথিবীতে আসার পরেও এরা বহু বছর পৃথিবীতে পাশাপাশি বাস করে গেছে বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। উন্নততর মানুষ এসে ওদের হটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এ কথাই আমরা জানি। কিন্তু সত্যিই তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কিনা সেই সত্যই এখন উদ্‌ঘাটন করতে হবে। তুই তো ইশারায় ইঙ্গিতে কথা বলতে ওস্তাদ, রিগেলের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করে দেখ্ না। ও তো কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখেছে বললি।"

"হ্যাঁ, তাই করব। দরকার হলে আর একবার সেই সবুজ দ্বীপে যেতে হবে। যেতে অসুবিধা নেই। আমার সেই রোগীরা কেমন আছে জানবার নাম করেই তো যাওয়া যেতে পারে। আমি গেলে তুই সঙ্গে যাবি তো?"

এবার হেসে বললাম "নিশ্চয়। এ আর বলতে? রিগেলকেও সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু।"

ভ্রম সংশোধন : লেখকের বক্তব্য

বৈশাখ সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৩৩ পাতায় (লাইন ২০) ছাপা হয়েছে, '……এই H-এর সংখ্যাটা যত বাড়ে পেনসিল ততো নরম হয়, অর্থাৎ ততো গভীর কালো দাগ পড়ে; এটি হবে, "পেনসিল ততো কম নরম হয়, অর্থাৎ ততো কম গভীর দাগ পড়ে।" অনবধানবশতঃ এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

বৈশাখ সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধারাবাহিক উপন্যাস শার্লক-হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ উপন্যাসের চতুর্থ লাইনে (পৃঃ ৬) 'ওয়েলস' শব্দটি অতিরিক্ত মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক।

সংখ্যাকূট

অসিতকুমার চক্রবর্তী

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী সংখ্যা বসিয়ে সমাধান কর :

পাশাপাশি

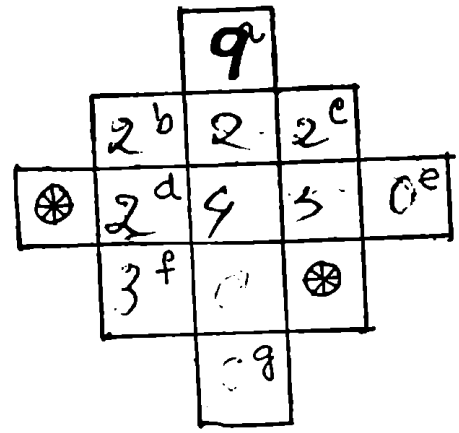

a—পৃথিবীর উপগ্রহ সংখ্যা ;
b—র‍্যাডনের পারমাণবিক ওজন ;
d—লোহার স্ফুটনাংক যত ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড ;
f—শুক্রগ্রহের নিজকক্ষে আবর্তনকাল যত ঘণ্টা ;
g—নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের যোজ্যতা।

উপর থেকে নিচে

a—শুক্রগ্রহের নিরক্ষীয় ব্যাস যত কিলোমিটার (প্রায়) ;
b—'ফ্রান্সিয়াম'-এর পারমাণবিক ওজন ;
c—ম্যাঙ্গানিজের পারমাণবিক সংখ্যা ;
e—জলের হিমাংক যত ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

(সমাধান পরের সংখ্যায়)

বৈশাখ সংখ্যার 'শব্দকূট'-এর সমাধান

১। আ	র্কি	মি	৩। ডি	৪। স
র্সে	৭। কো	কো	ম	স
২। নি	৫। কে	৬। ল	ক্রি	স
৯। ক	লা	র	টা	স্ব
৮। মে	স	ন	স	র

শতকরার সহজ নিয়ম

অরূপরতন ভট্টাচার্য

না, বাংলা নয়, ইংরেজি পার্সেন্ট কথাটার সঙ্গে সাধারণ সব মানুষেরই অল্পবিস্তর যোগাযোগ আছে। সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ফল বেরুলো। কি রকম পাশ করলো এবারে? সে হিসেব দেওয়া হয় পার্সেন্টে। পঞ্চায়েতের ভোট হলো। কেমন ভোট পড়লো এবারে? সে হিসেবও বলা হয় পার্সেন্টে। দেশে জনসংখ্যা বাড়লো—কতটা বাড়ল এক' বছরে? সে হিসেবও জানা যায় পার্সেন্টে।

পার্সেন্ট এবং সেই সঙ্গে আর একটি শব্দ আছে, তা হলো পার্সেন্টেজ। বাংলায় প্রথমটি শতকরা, দ্বিতীয়টি শতকরা হিসাব। শতকরাকে যদি ভেঙ্গে বলি, তাহলে পাবো শত করা। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার মত শব্দ শত। শত অর্থ একশো। তাহলে শতকরার মধ্যে একশো আছে। এবং এই একশো, সত্যি কথা বলতে কি, এটাই হচ্ছে শতকরার আসল কথা। যদি সংজ্ঞা দিই, তাহলে প্রতি ১০০-এর উপরে বা প্রতি ১০০-এর ভিত্তিতে যে হিসেব শতকরা বলতে তাই বুঝবো।

কেন? অন্য কোনো সংখ্যায় না এনে কোনো হিসেবকে ১০০-এর ভিত্তিতে নিয়ে আসার দরকার কি?

দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কারের অনেক আগে, নানা হিসেব-নিকেশ করা হত দশের ভিত্তিতে, বা একশোর ভিত্তিতে। একের দশমাংস, তিনের দশমাংশ বা একের শতাংশ, পনেরোর শতাংশ। হতে পারে, এই ভগ্নাংশ আসে অর্থের হিসেব-নিকেশে বা এমনও হওয়া সম্ভব যে, এই ভগ্নাংশের দরকার ছিল সময়ের বিভাজনে।

মধ্যযুগে, পূর্বের এবং পশ্চিমের সভ্যজগতে সর্বত্র যখন ব্যবহারে অনেক বড় সংখ্যা আসতে লাগল ধীরে ধীরে, তখন ভগ্নাংশের ভিত্তি হিসেবে অন্য কোনো ছোট সংখ্যা না এসে, এসে গেল ১০০। এই ১০০-ই শতকরার মূল কথা।

সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ফলের কথা ধরা যাক। মনে করি, গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭১১। সংখ্যাটা নেহাৎ ছোট নয়। যদি এই পরীক্ষায় পাশ করে থাকে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫০ জন ছাত্রছাত্রী, তাহলে ফেল করেছে অনেকে, বা পাশ করেছে খুব কম, এমন কথা বলা যায় না। হয়তো বলা যায়, পাশ করেছে মাঝামাঝি। কিন্তু অনেক, কম বা মাঝারি, পাশের হিসেব যে ভাবে ইচ্ছে দিই না কেন, তাতে কিন্তু পাশের চেহারাটা পরিষ্কার নয় আর সেটা গণিত নির্ভরও হল না। একেবারে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫০ বললে খুব ভাল হয়, তাতে পাশটা নিখুঁত বোঝানো হয় ঠিকই, কিন্তু কতজনের মধ্যে কতজন পাশ করলো, তা একদমই বোঝানো যায় না। তা ছাড়া ১ লক্ষ, আর ওই যে বললাম, ৭২ হাজার ৮৫০ এমন একটা বড় সংখ্যা যা সহজে নাড়াচাড়ার উপযুক্ত নয়, প্রসঙ্গক্রমে বলা অসুবিধেজনক।

শতকরা এমন একটা ব্যাপার যাতে সব দিকটাই রক্ষা করা হয়েছে কৌশল করে। পাশ ফেলের হিসেবটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ১০০-এর চেয়ে ছোটো একটা সংখ্যায়। এর থেকে ঠিক কত জন পরীক্ষা দিচ্ছে তা জানা যাচ্ছে না, ঠিক কত জন পাশ করছে, তাও নয়, কিন্তু তুলনায় যে হিসেবটা আসছে তাতে কোনো গোল-মাল নেই।

৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১ লক্ষ ৭২ হাজার মানে শতকরা হিসেবে তা কত? নিঃসন্দেহে শতকরা ৫০-এর মত। তার মানে এই নয় যে, ৫০ জন পাশ করল, তার মানে এই নয় যে, সবসুদ্ধ ১০০ জন বসেছে পরীক্ষাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঠিক যে, ১০০ জনের হিসেবে পাশ করেছে ৫০। অর্থাৎ ১০০০-এ ৫০০, ১ লাখে ৫০ হাজার আর ৩ লাখে দেড় লাখ। অবশ্য শতকরা হিসেবের সঙ্গে কতজন পরীক্ষায় বসছে যদি উল্লেখ করা হয় তো আর কোনো অসুবিধাই থাকে না কোথাও। কতজন পরীক্ষায় পাশ করলো, নিখুঁতভাবে বেরিয়ে আসে।

ভোটের বেলাতেও তাই। ভোটার-লিস্টে কতজন ভোটারের নাম আছে? তাদের মধ্যে কতজন ভোট দিচ্ছে? দুটো সংখ্যার কোনোটাই ছোট নয়। কিন্তু এই দুটো সংখ্যা থেকে ১০০ জন ভোটারে কতজন ভোট দিচ্ছে তা খুব সহজেই বের করা যায় ঐকিক নিয়মে।

জন্ম বা মৃত্যুর সময়েও হিসেব বেরিয়ে আসে একই

রকমে। অধিবাসী কতজন? জন্মের বেলায় কতগুলি নতুন মুখ আসছে সেখানে—এই হিসেবটুকু দরকার। মৃত্যুর বেলায় কতজন ছেড়ে যাচ্ছে এই ইহজগৎ। তারপর ১০০-এর ভিত্তিতে শতকরা হিসেব।

শতকরার পদচারণ দুনিয়ার সর্বত্র। ব্যবসায়ে, সুদের হিসেবে, সংসারের আয়ে-ব্যয়ে, পরীক্ষার পাশ-ফেলে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে—কিসে নয়?

কিন্তু শতকরার যে কোনো হিসেবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। শতকরা হিসেব সব সময়েই করা হয় এক জাতীয় বা একই ধরনের দুটি রাশির মধ্যে। টাকার সঙ্গে টাকার, মানুষের সঙ্গে মানুষের, ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্রের, ওজনের সঙ্গে ওজনের, দৈর্ঘ্যের সঙ্গে দৈর্ঘ্যের। শতকরা হিসেবে একটি রাশিকে আর একটি সমজাতীয় রাশির তুলনায় প্রকাশ করা হয় এবং, ১০০-এর ভিত্তিতে।

কিন্তু যদি বলি, ওজনকে মেলাবো মানুষের সঙ্গে আর এই দুটিকে মিলিয়ে শতকরা হিসেব বের করবো, তাহলে?

ধরা যাক, ৫ জন মানুষের বর্তমান ওজন ২০০ কিলোগ্রাম, বছরের শেষে এদের ওজন দাঁড়ালো ২২০ কিলোগ্রাম। তাহলে তাদের শতকরা কত কিলোগ্রাম ওজন বাড়লো, বের করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়।

এখানে মানুষ আছে, কিন্তু সে মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র, সম্পর্ক যেটা, সেটা ওজনের সঙ্গে ওজনের।

অবশ্য মানুষের সঙ্গে ওজনের সম্পর্ক দিয়েও অনেক সমস্যা আছে।

১০টি ছেলের ওজনের সমষ্টি ৫১০ কিলোগ্রাম। তাহলে একটি ছেলের গড় ওজন কত?

কিন্তু এ অঙ্ক শতকরার অঙ্ক নয়।

পূজোর আগে জুতোর দোকানে, কাপড়ের দোকানে ফেস্টুন ওড়ে, নজরে আসে। তাতে রিডাকসন অর্থাৎ দাম কমিয়ে দেওয়ার খবরটা থাকে। 'ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকসন, টেন পার্সেন্ট রিডাকসন, টুয়েনটি পার্সেন্ট, রিডাকসন। সেল! সেল!! সেল!!! সেখানে পার্সেন্ট অবশ্য কথায় লেখা হয় না। পার্সেন্টের আলাদা চিহ্ন আছে, তা হলো '%'। চিহ্নটা সংক্ষিপ্ত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও কিন্তু পার্সেন্টের এই চিহ্ন ছিল না। আজকের চিহ্নের বদলে পার্সেন্ট বোঝানোর জন্যে তখন লেখা হতো 'পার ÷'। শেষে পার কথাটি বাদ পড়লো। চিহ্নটা কি রকম দাঁড়ালো তখন? ÷ নিশ্চয়। এই থেকেই এল এ যুগের পার্সেন্টের চিহ্ন। পুরো পার্সেন্ট লিখতে গেলে যতটা জায়গা লাগে তার চেয়ে অনেক কম জায়গা লাগছে এখানে।

কিন্তু ৬০ টাকায় যার দাম বাঁধা রিডাকসনের ফলে সেটা কেনা হবে কত টাকায়?

ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকসন হলে ১০০ টাকায় ৫ টাকা বাদ, তাহলে ১ টাকায় $\frac{৫}{১০০}$ টাকা বাদ, ৬০ টাকায় তাহলে বাদ যাবে $\frac{৫ \times ৬০}{১০০}$ টাকা অর্থাৎ ৩ টাকা।

তাহলে ৬০ টাকা যার মূল্য, কিনছি তা ৫৭ টাকায়।

টেন পার্সেন্ট রিডাকসন হলে ঠিক একই ভাবে হিসেব করে দেখতুম, বাদ যাচ্ছে ৬ টাকা।

এখানে জিনিসের ছাপ মারা দাম থেকে রিডাকসনের পরিমাণ বের করে বাদ দিচ্ছি আর কেনা-বেচার আসল দাম বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রিডাকসন আলাদা করে বাদ না দিয়ে আমরা কেনা-বেচার আসল দামটুকু সরাসরি বের করে ফেলতে পারি।

ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকসনে ১০০ টাকা ছাপ মারা দাম হলে দাম কমে ৫ টাকা, তার মানে কেনাবেচার দাম ৯৫ টাকা। তাহলে

১০০ টাকা হচ্ছে ৯৫ টাকা

১ টাকা হচ্ছে $\frac{৯৫}{১০০}$ টাকা

৬০ টাকা হচ্ছে $\frac{৯৫ \times ৬০}{১০০}$ টাকা = ৫৭ টাকা।

দাম কমার বেলাতে যে রকম, দাম বৃদ্ধির বেলাতেও সে রকম। শুধু বর্ধিত দামটুকু বের করে ছাপ মারা দামের সঙ্গে তা যোগ করতে পারি কিম্বা সরাসরি এখনকার মূল্যমানও বের করে নিতে পারি।

শতকরার প্রাথমিক ধারণাগুলি ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরা যাক:

যদি বলি:

$\frac{৩}{৪}$ কে শতকরা হিসেবে প্রকাশ কর

$$\frac{৩}{৪} = \frac{\frac{৩}{৪} \times ১০০}{১ \times ১০০} = \frac{৭৫}{১০০} = ৭৫\%$$

এখানে একটা কথা বলে রাখি, যে কোন সামান্য বা দশমিক ভগ্নাংশকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

উল্টোভাবে শতকরায় দেওয়া হিসেবকে ১০০ দিয়ে ভাগ করে ভগ্নাংশে নিয়ে আসা চলে।

যদি বলা যায় ঃ

$৫\frac{১}{৩}\%$ কে ভগ্নাংশে নিয়ে এস।

তাহলে $৫\frac{১}{৩}\% = \frac{১৬}{৩} = \frac{১৬}{৩ \times ১০০} = \frac{৪}{৭৫}$

আর যদি বলি ঃ

৭০০ টাকার $৩\frac{১}{২}\%$ = ?

১০০ টাকায় $\frac{৭}{২}$ টাকা

১ টাকায় $\frac{৭}{২ \times ১০০}$ টাকা

৭০০ টাকায় $\frac{৭ \times ৭০০}{২ \times ১০০}$ টাকা

অর্থাৎ ২৪$\frac{১}{২}$ টাকা

এইবার নীচের সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(i) ৬৫ টাকার ২০% = কত ?
উত্তর ঃ ...

(ii) কত টাকার ৭০% = ৮৪ টাকা ?
উত্তর ঃ ...

(iii) ১৫৬ টাকার কত% = ১৩ টাকা ?
উত্তর ঃ ...

(iv) ৩৭ টাকার ১০০% = কত ?
উত্তর ঃ ...

(v) ·৮ শতকরা হিসেবে কত ?
উত্তর ঃ ...

(vi) $\frac{৫}{২}$ শতকরা হিসেবে কত ?
উত্তর ঃ ...

(vii) ·২৪ শতকরা হিসেবে কত ?
উত্তর ঃ ...

(vii) ২৭% ভগ্নাংশে কত ?
উত্তর ঃ ...

(ix) ·৬৪ এবং $\frac{১৬}{৫}$ শতকরা হিসেবে দুটির মান বের কর।

শতকরার প্রাথমিক ধারণা তৈরিতে এই প্রশ্নগুলি সাহায্য করবে। কিন্তু তারপর এই ধারণাকে বিবিধ প্রশ্নের ভেতর দিয়ে আমরা অনেকখানি বাড়িয়ে তুলতে পারি।

আমার বাড়ির ভাড়া ৫০০ টাকা। বাড়িওয়ালা বলেছেন, শতকরা ১০ টাকা করে বাড়িভাড়া বাড়াতে হবে বছরে। তাহলে ৫ বছর বাদে বাড়িভাড়া কত হবে ?

শুধু সামনের বছরের বাড়ি ভাড়া হলে ব্যাপারটাতে চিন্তার কোনো কারণ থাকতো না।

শতকরার গোড়ায় নেমে আসবো প্রথমে। ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া হলে তা বেড়ে হচ্ছে ১১০ টাকা। এইবার ঐকিক নিয়মের সাহায্য নিয়ে ১ টাকা হচ্ছে $\frac{১১০}{১০০}$ টাকা। তাহলে ৫০০ টাকা হবে $৫০০ \times \frac{১১০}{১০০} = ৫৫০$ টাকা।

প্রথম বছরের শেষে অবস্থাটা এই।

ভাড়া বাড়ীর শতকরা হিসেব বা হারটুকু বদলাচ্ছে না। তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে, কষে দেখো, ভাড়া হবে $৫০০ \times \left(\frac{১১০}{১০০}\right) \times \left(\frac{১১০}{১০০}\right) = ৫০০ \times \left(\frac{১১০}{১০০}\right)^২ =$ ৬০৫ টাকা।

তাহলে ৫ বছরের শেষে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ?

তা হবে $৫০০ \times \left(\frac{১১০}{১০০}\right)^৫$ টাকা

এইভাবে ১০, ১৫, ১৮ বা ২০ বছরের ভাড়াও আমরা বের করতে পারি।

যদি সূত্রের সাহায্যে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করি, তাহলেও তা বলা যায় সুন্দরভাবে। বছরের গোড়ায় ভাড়া p, ভাড়া বৃদ্ধির হার r অর্থাৎ শতকরা r এবং বছরের সংখ্যা যদি হয় n, তাহলে ১০০ টাকা ভাড়া ১ বছরের শেষে হয়ে যাচ্ছে ১০০ + r তাহলে, n বছরের শেষে p টাকা ভাড়া হবে $P\left(\frac{১০০ + r}{১০০}\right)^n$।

ভাড়া ঠিক কতটা বাড়ল তাও নিশ্চয় বের করা যাবে।

ভাড়া বৃদ্ধির বদলে যদি ভাড়া কমের হিসেবের দিকটিতে আসি !

ব্যাপারটা অবশ্য স্বাভাবিক নয়। কে আছেন যিনি এই দুর্মূল্যের বাজারে ভাড়া কমিয়ে যাবেন. ভাড়া বাড়ানোর বদলে ? আর সেই শতকরা ১০ হিসেবেই।

ভাড়া বৃদ্ধির সময়ে দেখেছি ১০০ টাকা বেড়ে হচ্ছে ১১০ টাকা বছরের শেষে। এখানে কি ১১০ টাকা

কমে হবে ১০০? শতকরার পাঠে অভ্যস্ত না হলে ভুল হয়ে যায় এখানেই। যে কথা বলে এই লেখা লিখতে শুরু করেছিলাম সেই কথা আবার বলি। ব্যাপারটা শত-করা। ১০০-এর ভিত্তিতে হিসেব। ১১০-এর ভিত্তিতে, নয়। ১১০ কমে ১০০ হলে হিসেবটা হয় ১১০-এর ভিত্তিতে, ১০০-এর ভিত্তিতে নয়। ফলে ১১০ কমে ১০০ হবে না, যা হবে, তা হল ১০০ কমে ৯০।

এইটুকু মনে রেখে আগের মত এগিয়ে যাই। আজ যদি ভাড়া ৫০০ থাকে, তাহলে ৫ বছর বাদে ভাড়া হবে $৫০০\left(\frac{৯০}{১০০}\right)^৫$ টাকা। কিম্বা যদি সূত্রের কথা বলি, তাহলে $p\left(\frac{১০০-r}{১০০}\right)^n$ হবে n বছর বাদের ভাড়া।

দু একটা সহজ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

যদি কোন শহরের লোকসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা ১০ জন করে বৃদ্ধি পায়, এবং শহরের বর্তমান লোকসংখ্যা ১৩৩১০০০ হয়, তা হলে এখন থেকে ৩ বৎসর পরে শহরের লোকসংখ্যা কত হবে?

যদি সূত্র ব্যবহার করি, তা হলে পাবো $p = ১৩৩১০০০$, $r = ১০$ এবং $n = ৩$। কোন্ সূত্রটিতে বসাবো এই মানগুলি? বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আছে, নির্দিষ্ট বছরের শেষে লোকসংখ্যা $= p\left(\frac{১০০ + r}{১০০}\right)^n$। তাহলে তৃতীয় বছরের শেষে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ১৭৭১৫৬১।

বর্তমান লোকসংখ্যা ১৩৩১০০০ ধরে আমরা আজ থেকে ৩ বছর পরের লোকসংখ্যা বের করলাম ১৭৭১৫৬১, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকে হিসেব করলাম। লোকসংখ্যা বাড়লেও পারছি, বাড়ির ভাড়া বাড়লেও এবং লোকসংখ্যা কমলেও পারবো, সেই সঙ্গে বাড়ির ভাড়া কমলেও। হাতে পাঁজির মত হাতে সূত্র আছে, তা ছাড়া সে সূত্র কি ভাবে এসেছে, তাও দেখেছি।

কিন্তু ভবিষ্যতের মত অতীতকেও কি হিসেব করতে পারি সেই সঙ্গে?

বর্তমান লোকসংখ্যা ১৩৩১০০০, শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি, ৩ বৎসর পূর্বে লোকসংখ্যা কত? ৩ বছর পরের লোকসংখ্যার বেলায় দেখেছি, তৃতীয় বছরের শেষে লোকসংখ্যা $= \left(\frac{১১০}{১০০}\right)^৩ \times$ বর্তমান লোকসংখ্যা।

এখন যদি এই সূত্রের বছরকে ৩ বছর পিছিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে

বর্তমান লোকসংখ্যা $= \left(\frac{১১০}{১০০}\right)^৩ \times$ ৩ বছর আগের লোকসংখ্যা। তাহলে ৩ বছর আগের লোকসংখ্যা $= \left(\frac{১০০}{১১০}\right)^৩ \times$ বর্তমান লোকসংখ্যা। আর বর্তমান লোকসংখ্যা ১৩৩১০০০ বলে ৩ বছর আগের লোকসংখ্যা ১০০০০০০।

আর লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বদলে যদি কমে আসে! যদি কোনো একটি রোগ এসে দেখা দেয় শহরে, প্রতি বছর একই সময়ে, ধরা যাক কয়েক হাজার লোক মারা পড়ছে, মৃত্যু হচ্ছে শতকরা একটা নির্দিষ্ট হারে, তাহলেও লোকসংখ্যা বের করা কঠিন নয় [এবং আমরা তা শিখেছি], সে লোকসংখ্যা আজ থেকে কয়েক বছর আগের বা পরের যাই হোক না কেন।

শতকরার হিসেবে কয়েকটা কথা সব সময়ে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কেউ ব্যবসায় নেমেছে। পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাভ হচ্ছে?

সহাস্য উত্তর এল, সেণ্ট পার্সেণ্টে।

সেণ্ট পার্সেণ্ট মানে কি?

সেণ্ট পার্সেণ্ট মানে একশো টাকায় একশো টাকাই লাভ। আরও সহজ হিসেবে বলা যায় যে, টাকায় টাকাটা আসে।

লাভের অঙ্ক যদি আরও অনেক চড়ে যায়, তাহলে টু হানড্রেড পার্সেণ্টও আসতে পারে। ১০০ টাকা ব্যবসায়ে ঢাললে টু হানড্রেড পার্সেণ্ট লাভ, ঠিক কত টাকা বোঝাবে? ১০০ টাকায় যদি ঘুরে আসে ৩০০, তাহলে লাভ ২০০ অর্থাৎ টু হানড্রেড পার্সেণ্ট বা দ্বিগুণ।

কিন্তু ব্যবসায়ে ঠিক কত টাকা নামানো হবে তার তো কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ১০০-এর চেয়ে অনেক বেশি মূলধন নিয়েও কেউ নামতে পারে। আর সামান্য, ১০০-এর চেয়ে কম মূলধনও কারোর ব্যবসার মূলধন হতে পারে। সে যাই-ই হোক, ১০০০০ টাকায় ১০০০০ টাকা লাভ হলেও সেণ্ট পার্সেণ্ট, আবার ৩০ টাকায় ৩০ টাকা হলেও পার্সেণ্টের পরিমাণ এক। আবার ১০০০০ টাকায় ২০০০০ টাকা লাভ হলে পার্সেণ্টের পরিমাণ টু হানড্রেড, ৩০ টাকার বেলায় টু হানড্রেড পার্সেণ্ট মানে লাভ ৬০ টাকা।

কিন্তু হানড্রেড বা টু হানড্রেডের মত আরও কয়েকটা পার্সেণ্ট চালু আছে ইংরেজিতে। টুয়েনটি ফাইভ পার্সেণ্ট. মানে কতটা? পরীক্ষার ফল বেরোনোর পরে যদি কেউ বলে যে, ক্লাসে যত ছেলে ছিল, শতকরা হিসেবে তার ২৫ ভাগ ফেল করেছে, তা হলে ফেল নিশ্চয়ই সিকি-ভাগ। $\frac{২৫}{১০০}$ মানে $\frac{১}{৪}$ আর তাকেই বলে সিকিভাগ।

তাহলে ১২০তে টুয়েনটি ফাইভ পার্সেণ্ট মানে ৩০। ২০০তে ৫০। ৪০০তে ১০০, ৫০০-এ ১২৫।

সে রকম টুয়েলভ এনড হাফ পার্সেণ্ট মানে $\frac{১২\frac{১}{২}}{১০০}$ অর্থাৎ $\frac{১}{৮}$ ভাগ।

দোকানে কেউ কিছু কিনতে গেছে। দোকানদার বললে ১২½ পার্সেণ্ট ডিসকাউণ্ট দেবো। তার মানে ১০০ টাকার জিনিসে ১২½ টাকা। কিন্তু সব সময়ে যে জিনিসের দাম ১০০ হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। জিনিসের দাম যাই হোক. ১০০ টাকার হিসেবে ডিসকাউণ্ট ১২½। ৮ টাকায় তাহলে ১ টাকা, ১২ টাকায় ১½ টাকা—এই রকম আর কি!

নীচের ফলগুলি মনে রাখা দরকার ঃ

৫০% = ½
৩৩⅓% = ⅓
২৫% = ¼
২০% = ⅕
১২½% = ⅛
১০% = $\frac{১}{১০}$
৮⅓% = $\frac{১}{১২}$
৬¼% = $\frac{১}{১৬}$

যে কথা এতক্ষণ ধরে বললাম, তাই শতকরা হিসেবের প্রথম কথা আর আসল কথাও বটে, তবু বিদ্যার্থীরা প্রাথমিক অঙ্কগুলি কষতেও অনেক সময়ে ভুল করে।

যদি রামের আয় শ্যামের আয় অপেক্ষা ২৫% বেশি হয়, তাহলে শ্যামের আয় রামের আয় অপেক্ষা শতকরা কত কম?

শতকরার ধারণা না থাকলে মনে হবে, একজনের যতটা বেশি, অন্যের ততটা কম। কিন্তু শতকরায় তা নয়। শতকরা ২৫ বেশি মানে কি? শ্যামের আয় ১০০ হলে রামের আয় ১২৫। শ্যামের আয় নিশ্চয় ২৫ কম। কিন্তু শতকরা হিসেবে এবং রামের আয়ের চেয়ে? রামের আয় ১২৫, তাহলে ১২৫ টাকায় ২৫ টাকা কম, ১০০ টাকায় ২০% কম।

তাহলে এখন বলতে হবে, P টাকার ৩০% = Q টাকার ৪০% হলে, Q টাকা P টাকার কত%?

কিম্বা যদি বলি, A-এর বেতন B-এর বেতনের থেকে ১০% বেশি, আবার C-এর বেতন A-এর বেতন থেকে ১০% কম। তাহলে B-এর বেতন থেকে C-এর বেতন শতকরা কত কম বা বেশি?

[**নির্দেশ ঃ** B = ১০০ হলে A = ১১০। আবার C = ৯৯]

নির্দেশ অনুসারে দেখা যাচ্ছে কম। এখন বাকি রইল, শতকরা হিসেবে সেই কমটুকু বের করা।

কিন্তু যদি বলি, C-এর বেতন থেকে B-এর বেতন শতকরা হিসেবে কম না বেশি, তাহলে?

শতকরায় আর এক ধরনের অঙ্ক আছে, শুনলেই তা বড় হেঁয়ালি মনে হয়, দুর্বোধ্য ভেবে ছেলেরা তা সরিয়ে রাখে।

চায়ের দাম শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে গেলে, ব্যবহার কত কমাতে হবে যাতে খরচ অপরিবর্তিত থাকে?

জিনিসপত্রের দাম এ রকম প্রায়ই বাড়ে এবং তখন সমতা রক্ষারও দরকার হয়। তবে সে সমতা রক্ষা করতে হয় বাড়ির মায়েদের। তাঁরা অবশ্য কাগজ-কলম নিয়ে শতকরার হিসেব বের করেন না, তাঁরা করেন অভিজ্ঞতা দিয়ে।

কিন্তু তোমরা?

মূল্য শতকরা ২৫ টাকা বৃদ্ধি পেলে, আগে ১০০ টাকায় যতটা চা পাওয়া যেত, এখন তার মূল্য ১২৫ টাকা। কিন্তু আমার তো ১০০ টাকার চেয়ে বেশি খরচ করার উপায় নেই। তাহলে, এখন ১০০ টাকায় কতটা চিনি পাবো?

আগে যা পেতুম, এখন পাবো তার চেয়ে কম এবং তার $\frac{৪}{৫}$ ভাগ $= \frac{১০০}{১২৫}$। তাহলে $\frac{১}{৫}$ ভাগ কমাতে হবে। আর $\frac{১}{৫}$ ভাগ মানে $\frac{১০০}{৫}\% = ২০\%$

পরীক্ষার পাশ ফেল নিয়ে এক ধরনের অঙ্ক আছে এবং এই অঙ্কও রীতিমত প্রচলিত অঙ্ক। যেহেতু অঙ্ক কষা সহজ, সেইজন্যে এই অঙ্কও কঠিন নয় আর অল্প আয়াসেই এই অঙ্কের সমাধান বের করা যায় কিন্তু

সবচেয়ে ভাল হয় যদি ছবি এঁকে এই অঙ্কের সমাধান বের করবার চেষ্টা কর।

ছবি এঁকে? শতকরার অঙ্কে?

হ্যাঁ, ছবি এঁকেই। তখন সমস্ত অঙ্ক-চিত্রটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আর উত্তর বেরিয়ে আসে এক রকম অঙ্ক না কষেই।

কোন পরীক্ষায় ৮০% ইংরাজিতে. ৮৫% অঙ্কে এবং ৭৫% উভয় বিষয়ে পাশ করল। তা হলে

(·) কেবলমাত্র ইংরাজিতে শতকরা কতজন পাশ করল?

(i) কেবলমাত্র অঙ্কের শতকরা কতজন পাশ করল?

ছবি দেখে কি কিছু বুঝতে পারছো?

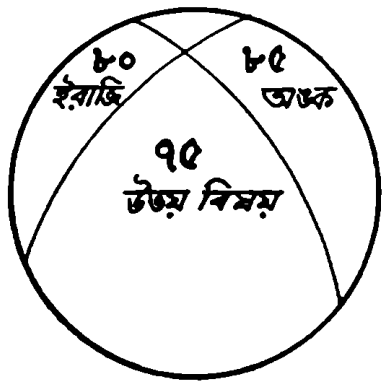

ধরেই নিই, সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০০। তাহলে ইংরাজিতে পাশ করল ৮০, অঙ্কে ৮৫ আর দুটি বিষয়ে পাশ করল ৭৫ জন। কিন্তু ইংরাজিতে যারা পাশ করেছে, তারা তো সবাই অঙ্কে পাশ করে নি। ৮০ জনের মধ্যে অঙ্কেও পাশ করেছে, এমন সংখ্যা ৭৫। তাহলে শুধু ইংরাজিতে পাশ করেছে এমন সংখ্যা মাত্র ৫ (=৮০−৭৫)। এবার অঙ্কের দিকে তাকানো যাক। অঙ্কে পাশ করেছে ৮৫ জন। কিন্তু যারা অঙ্কে পাশ করেছে, তারা সবাই ইংরাজিতে পাশ করেনি। অঙ্কে পাশ এবং সেই সংগে ইংরেজিতেও পাশ, এমন সংখ্যা ৭৫। তাহলে শুধু অঙ্কে পাশ ৮৫ − ৭৫ = ১০।

তাহলে (i) এর উত্তর ৫%, (ii) এর উত্তর ১০%।

ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ভেবে দেখার জন্যে একটা এই ধরনের অঙ্ক দেওয়া হলো।

কোনো পরীক্ষায় ভাষা ও বিজ্ঞানে পাশের হার যথাক্রমে ৭০% ও ৮০% এবং ৬৫% উভয় বিষয়ে পাশ করে। যদি ১৫০ জন উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, তা হলে পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা কোনটি।

(i) ১৫০০ (ii) ১০০০ (iii) ৭৫০

[**নির্দেশ :** যদি মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০০ ধরি, তাহলে ভাষা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে পাশের সংখ্যা = ৬৫, ভাষায় পাশ ও বিজ্ঞানে ফেলের সংখ্যা = ৫, বিজ্ঞানে পাশ ও ভাষায় ফেলের সংখ্যা = ১৫।

অতএব উভয় বিষয়ে ফেল = ১০০ − ৬৫ − ৫ − ১৫ = ১৫]

শতকরায় আর এক ধরনের কায়দার অঙ্ক আছে। বুদ্ধিতে ভাল করে শান দেওয়ার পরেই এ অঙ্ক কষা যায়।

খাঁটি দুধে ৮৯% জল থাকে। কোনো ভেজাল দুধে ৯০% জল আছে। এই ধরনের ২২ লিটার ভেজাল দুধে কত জল মেশানো হয়েছে?

খাঁটি দুধে শতকরা ৮৯ যখন জল, তখন ১১ দুধের পরিমাণ। ভেজাল দুধে সেখানে ১০ দুধ যখন জল ৯০, তাহলে ১ দুধে জল ৯। খাঁটি দুধে, দুধের পরিমাণ ১১; ভেজাল দুধ করছি যখন, কতটা জল থাকছে সেখানে?

ভেজাল করবার সময়ে খাঁটি দুধের ভেতরে দুধের পরিমাণ বদলাচ্ছে না। তার পরিমাণ ১১ ছিল, থাকছে ১১ই। ভেজালের বেলায় আসছে কেবল জলই।

ভেজাল দুধের বেলায় ১ দুধ হলে জল থাকবে ৯ দুধ ১১ই।

তাহলে ১১ দুধে জল ৯৯।

কিন্তু খাঁটি দুধে জল তো ছিল ৮৯। তাহলে জল ঢালছি ১০।

এখন ১০০ লিটার দুধ ভেজাল করবার জন্য ১০ লিটার জল ঢাললাম। হল ১১০।

অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই :

১১০ লিটার ভেজাল দুধে জল ১০ লিটার, ২২ লিটারে কত?

ঐকিক নিয়মে পরিমাণ আসে ২ লিটার।

আর একটি অঙ্ক নেওয়া যাক এই ধরনের।

খাঁটি দুধে ৮৮·৭৫% জল থাকে কিন্তু কোনো দুধের নমুনার ৯০% জল পাওয়া গেল। এই নমুনার ১৮ লিটারে কত ভেজাল আছে?

অনুশীলনী :

শতকরা যে কঠিন নয় অনুশীলনীতে দেওয়া কয়েকটি অঙ্ক কষার চেষ্টা করলেই তা বুঝতে পারবে। এতক্ষণে যা শিখেছো, তাতে কোনো অঙ্কই কঠিন মনে হওয়ার কারণ নেই। এই অঙ্কগুলি স্কুল ফাইনালে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে বা পরীক্ষায় আসতে পারে এমনই অঙ্ক। যে অঙ্ক কঠিন মনে হতে পারে তাতে একটু নির্দেশও দিয়ে দিচ্ছি।

১। কোন গ্রামের অধিবাসীর ১০% কলেরায় মারা যাওয়ায় অবশিষ্টের ২০% ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। যদি লোকসংখ্যা কমে ৫০৪ হয়, তবে প্রথমে গ্রামে কত লোক ছিল? উত্তর ঃ ৭০০

[**স্কুল ফাইনাল '৫৮**]

২। একটি পাত্রে জলমিশ্রিত দুধ আছে, তাতে শতকরা ১২½ ভাগ জল আছে। এরূপ ২০০ গ্যালন মিশ্রিত দুধে কি পরিমাণ জল মিশোলে ঐ নূতন মিশ্রণে শতকরা ৩৭½ ভাগ জল থাকবে? উত্তর ঃ ৮০ গ্যালন

[**স্কুল ফাইনাল '৬২**]

৩। কোন পরীক্ষায় ৮০% ছাত্র, ইংরাজিতে এবং ৮৫% অঙ্কে পাশ করল এবং ৭৫% উভয় বিষয়েই পাশ করল। যদি উভয় বিষয়ে ৪৫ জন ছাত্র ফেল করে থাকে, তবে মোট কতজন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল?

উত্তর ঃ ৪৫০

[**কলি. বিশ্ব. '৩৮**]

৪। এক ব্যক্তির মূলধন প্রতি বৎসর ২০% হারে বৃদ্ধি পায়। যদি চতুর্থ বৎসরের শেষে মূলধন ৫১৮৪ টাকা হয়, তবে প্রথমে তার মূলধন কত ছিল?

উত্তর ঃ ২৫০০ টাকা

[**কলি. বিশ্ব. '৫০**]

৫। কোন একটি শহরের লোকসংখ্যা ২০০০০ ছিল। যদি পুরুষের সংখ্যা শতকরা ১০ জন হিসেবে বাড়তো এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৬ জন হিসেবে কমতো, তাহলে শহরটির লোকসংখ্যার কোন পরিবর্তন হত না। শহরটিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা নির্ণয় কর।

[**কলি. বিশ্ব.**]

[**নির্দেশ ঃ** মনে কর, পুরুষের সংখ্যা x। তাহলে

$$x \times \frac{১১০}{১০০} + (২০০০০ - x) \times \frac{৯৪}{১০০} = ২০০০০$$

উত্তর ঃ পুরুষ ৭৫০০

স্ত্রী ১২৫০০

শতকরা গণিতের একটা খুবই উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এবং যতটুকু আছে আমাদের পাটীগণিতে, বলতে গেলে তার সবটুকুই আমাদের জীবনে কাজে লাগে। ফলে আমরা তাকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না।

আর যে বিষয় একটু আয়াসেই অভ্যাস করা চলে, তাকে আমরা বাদ দিয়েই বা চলবো কেন?

১০৩/ই কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

বিজ্ঞানের টুকরো খবর

গাছ থেকে শক্তি

ফিলিপাইন্‌স্‌-এ নতুন এক 'শক্তি গাছ' আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফল কেরোসিন তেলের বদলে ব্যবহার করা চলতে পারে। স্থানীয় উদ্ভিদ দপ্তরের মতে, এই গাছের এক একটা ফল পনেরো মিনিট ধরে জ্বলতে পারে। বছরে একটা গাছ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বালতি ফল পাওয়া যাবে। স্থানীয় লোকেরা গাছটিকে চেনে 'বাংগলুম্‌ব্যাঙ' নামে। উদ্ভিদ দপ্তর এখনো গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে উঠতে পারেন নি। গাছটি যে কোন ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়, এবং এক হেক্টর জমিতে এরকম আড়াইশো-তিনশো গাছ চাষ করলে পাঁচ বছর পরেই ফল পাওয়া যাবে বলে দপ্তরের বিশ্বাস। ফলে এই পরিকল্পনাকেই তাঁরা কাজে রূপায়িত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পরমাণুর রঙীন ছবি

উনিশশো আটাত্তর সাল পরমাণুদের জীবনে এক স্মরণীয় বছর। কারণ সেই বছরেই তারা হতে পেরেছে রঙীন ছায়াছবির কুশীলব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিদ অ্যালবার্ট ভি. ক্রু এবং মাইকেল আইজ্যাক্‌সন ষোলো মিলিমিটার ফিল্মে আলাদা আলাদা-ভাবে ইওরাম, ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম এবং প্যালাডিয়াম পরমাণুর আট মিনিটব্যাপী রঙীন ছবি তুলেছেন। টরোন্টোর এক বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁরা এই ছবি প্রথম সবাইকে দেখান। ছবি তুলতে তাঁরা বিশেষভাবে তৈরী এক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করেছেন।

পরমাণুদের এমনিতে কোন রঙ নেই, তবে ভারী মৌলের পরমাণুগুলো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে সাদা-কালোয় একটু বেশি উজ্জ্বল দেখায়। পদার্থবিদ দুজন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মনগড়া রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন পরমাণুকে। এতে পরমাণুদের গতিবিধি আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এই ছবিতে পরমাণুদের আসল আকারকে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গুণ বড় করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, একটা আঙুরকে এমনিভাবে বড় করলে তার আকার হবে আমাদের এই পৃথিবীর সমান।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এই রঙীন ছবি পরমাণু-গবেষণার কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে।

যাযাবর পাখিরা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

পাখিদের মধ্যে অনেকেই যাযাবর। বিশেষ ক'রে যারা বাস করে অত্যধিক শীতের দেশে। যেমন—উত্তর বা দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি কোন জায়গায়। শীতকালে যখন চারিদিকে বরফ পড়তে শুরু করে, তখন তারা হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে চলে আসে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সেইসব জায়গায়, যেখানে শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। শীতকালটা সেখানে কাটিয়ে তারা আবার ফিরে যায় নিজ নিজ বাসভূমিতে।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের এরূপ স্থান থেকে স্থানান্তর গমন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক কাল ধরে। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে এ বিষয়ে অনেক পর্যবেক্ষণ

চালিয়েছেন। এর ফলে অনেক বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।*

উত্তর-আমেরিকায় যেমন উত্তর-ইউরোপেও তেমনি, বসন্ত সমাগমে যখন বরফ গলতে আরম্ভ করে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে যাযাবর পাখিরা সেখানে এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু শীতকালে তারা আবার চলে যায় সুদূর দক্ষিণ-আমেরিকায়, আফ্রিকায়, কিংবা এশিয়ার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে। এদের মধ্যে কোকিল (Cuckoo), ওয়ার্বলার (Warbler), সোয়ালো (Swallow), ফ্লেমিঙ্গো (Flamingo) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর-মেরু অঞ্চলে কয়েক মাস ধরে নিরবচ্ছিন্ন দিন চলতে থাকে। সেখানে যাদের আবাস, তারা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়, এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হলে তাদের লালন-পালন করে। তারপর শীতের প্রাক্কালে বাচ্চা-কাচ্চা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তারা আবার যাত্রা করে দক্ষিণ দিকে, প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই পথ-পরিক্রমা অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেমন—সোনালী প্লোভার (Golden Plover)-এর বাসস্থান কানাডায়। কিন্তু ওখানে যখন শীত নেমে আসে, তখন হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম ক'রে তারা চলে যায় সুদূর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এরা অবিরাম উড়ে যায় সীমাহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে। যাত্রাপথের সামান্য ভুল-ত্রুটি হলেই অকূল সমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত পাখিদের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! একটানা তিন-চার হাজার মাইল উড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এরা ঠিক পৌঁছে যায় নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে। পথ চিনে নিতে তাদের একটুও ভুল হয় না।

শিয়ারওয়াটার (Shearwater) নামক পাখিদের বিদেশ ভ্রমণ আরও বিস্ময়কর। এরা বাস করে দক্ষিণ-অস্ট্রেলিয়ায়। শীতের শুরুতেই এরা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম ক'রে চলে যায় সুমেরু অঞ্চলের অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। কারণ, সেখানে তখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু ওখানেও যখন শীত নেমে আসে, তখন তারা আবার ফিরে আসে আপন দেশে। কারণ, ততদিনে এখানে গ্রীষ্ম এসে গেছে। এইভাবে প্রতিবছরই, বলতে গেলে এক মেরু থেকে আর এক মেরু পর্যন্ত, যাতায়াতে তাদের পথ-পরিক্রমা করতে হয় অন্ততঃ ২১,০০০ মাইল।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে— swallow does not make mr, বাস্তবিক গ্রীষ্মের শুরুতেই ঝাঁকে ঝাঁকে সোয়ালো পাখিরা আসতে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এরা শীতকালটা কাটায় সুদূর দক্ষিণ-আফ্রিকায়। আর শীত শেষ হতেই প্রায় ৮০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তারা আবার চলে আসে নিজ নিজ আবাসে। পশ্চিম গোলার্ধের পাখিরা একই ভাবে আলাস্কা এবং দক্ষিণ পাটাগোনিয়ার মধ্যে যাতায়াত করে —এই দূরত্ব প্রায় ৯০০০ মাইল।

যাযাবর পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল অ্যাল্‌ব্যাট্রস্ (Albatross)। অনেকটা হাঁস জাতীয় সামুদ্রিক পাখি, রঙ সাদা ধবধবে। পাখা মেললে, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মাপ হয় বারো ফুট বা তারও বেশী। এর মতো উড়বার শক্তি অন্য কোন পাখির নেই। এরা বাসা বাঁধে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপে। অ্যাল্‌ব্যাট্রস সারা বছরে একটি মাত্র ডিম পাড়ে, এরা সন্তান বড় না হওয়া পর্যন্ত তাকে লালন-পালন করে। আর একমাত্র ডিম পাড়ার সময় ছাড়া, প্রায় সব সময়ই এরা শিকারের সন্ধানে সমুদ্রের উপরে উড়ে উড়ে বেড়ায়। এইভাবে ঘর ছেড়ে তারা চলে যায় হাজার হাজার মাইল দূরে। কিন্তু ডিম পাড়ার সময় হলেই তারা আবার ফিরে আসে আপন ঘরে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পাখিরা এমন যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করেছে প্রধানতঃ বাঁচার তাগিদে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং খাদ্যাভাবই হয়তো এর প্রধান কারণ। অধিকাংশ পাখিই কীট-পতঙ্গ, গুগ্‌লি-শামুক, নানারকম সামুদ্রিক প্রাণী বা মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে শীতকালে। যখন চারিদিক বরফে ঢেকে যায়, তখন সেখানে এসব খাদ্যের অভাব ঘটে, তাই তখন তারা চলে যায় অন্য কোন স্থানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে, যেখানে এসব খাদ্য পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা।

এইসব কারণে যাযাবর পাখিদের সাময়িক বাসস্থান নির্বাচন নির্ভর করে তাদের নিজ নিজ জন্মভূমির ভৌগোলিক অবস্থানের উপর। তাই দেখা যায়, শীতের প্রাক্কালে

---

* এই উদ্দেশ্যে ফাঁদ পেতে পাখি ধরা হয়। তারপর সেখানকার বিবরণ সংক্ষেপে লিখে, একটি তাবিচের মধ্যে ভরে, একটি আংটির সাহায্যে তা ঐ পাখির পায়ে আটকে দেওয়া হয়। দেশান্তরে যাওয়ার পর ঐ পাখি ধরা পড়লে, সে কোথা থেকে এসেছে, তা জানা যায়। তখন সেখানকার বিবরণ লিখে আবার ঐ কবচের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়। যাতে ঐ পাখি দেশে ফিরে গেলে, সেকথা জানা যায়। এইভাবে কোন্ পাখি কখন কোন্ দেশে যাচ্ছে—তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়।

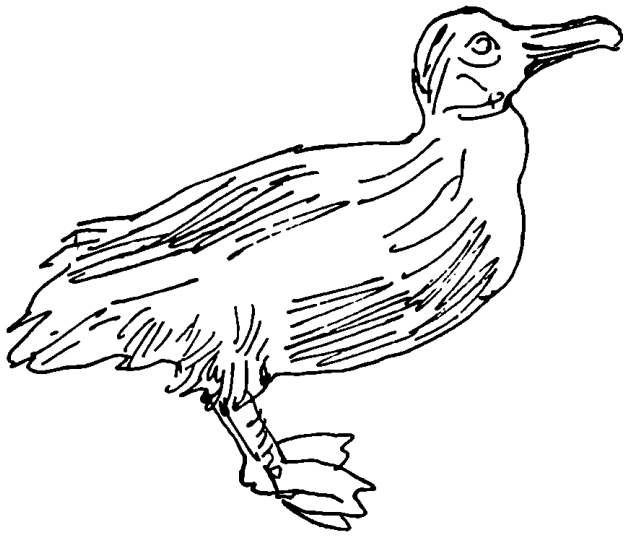

উত্তর গোলার্ধের পাখিরা চলে আসে দক্ষিণ গোলার্ধে, আর পার্বত্য অঞ্চলের পাখিরা নেমে আসে সমতল ভূমিতে। শীত ফুরালেই তারা আবার ফিরে যায় নিজ নিজ জন্মভূমিতে। বলাবাহুল্য, দক্ষিণ গোলার্ধের পাখিদের বেলায়, এই ঘটনা হয় বিপরীতমুখী।

আমরা দেখি, প্রতি বছরই শীতকালে অসংখ্য যাযাবর পাখি এসে ভিড় করে আলিপুরে চিড়িয়াখানার ঝিলে। এদের কেউ আসে নিকটবর্তী হিমালয় থেকে আবার কেউ আসে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে। একইভাবে ফ্লেমিঙ্গো বা কানঠুঁটিয়া পাখিদের সাময়িক আবাস গড়ে ওঠে ওড়িশার অন্তর্গত চিল্কা হ্রদে।

এখন প্রশ্ন—যাযাবর পাখিরা পথ চিনে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় কিভাবে? এইসব পাখিরা সারাদিন আহারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তাই অধিকাংশ পাখিই পথ চলে রাত্রিবেলা। কেউ পথ চলে একলা, যেমন—কোকিল (Cuckoo) ওয়ার্বলার (Warbler), ছোট শ্বেতগ্রীব (Lesser white:hroat) প্রভৃতি, আবার অনেকেই উড়ে যায় দল বেঁধে, যেমন—সোয়ালো (Swallow), ফ্লেমিঙ্গো (Flamingo) কিংবা বুনো হাঁসের দল (বলাকা) (Wildducks)।

বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, দিনের বেলা সূর্যের অবস্থান, আর রাত্রিবেলা বিভিন্ন তারকার অবস্থান, লক্ষ্য ক'রেই তারা অনায়াসে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছাতে পারে। এ বিষয়ে তাদের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর, তাই হিসেবে কোনরকম ভুলচুক হয় না।

অনেকেই মনে করেন, ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো এবং উষ্ণতার পরিবর্তন, আর সেই সঙ্গে উত্তরের কিংবা দক্ষিণের বাতাস, এ বিষয়ে তাদের প্রেরণা যোগায়, এবং দেশ থেকে দেশান্তর গমনে সহায়তা করে। বাস্তবিক, শরতের শেষে, উত্তর-মেরু অঞ্চলে যখন দিন ছোট হয়ে আসে এবং হিমেল হাওয়া বইতে আরম্ভ করে, তখনই সুদূরের পিয়াসী এইসব পাখিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর একদিন ডানা মেলে আকাশে উঠে যাত্রা করে অজানা প্রবাস-পথে। এই সময় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বাতাস বইতে থাকে। তাই অনুকূল বায়ু-প্রবাহে গা ভাসিয়ে এরা খুব সহজেই পৌঁছে যায় হাজার হাজার মাইল দক্ষিণে, নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে। শীতের শেষে আবার যখন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বাতাস বইতে শুরু করে, তখন তারা আবার ঘরে ফেরার প্রেরণা অনুভব করে। এবারও অনুকূল বায়ু-প্রবাহ তাদের সহায়তা করে, এবং তারা সহজেই ফিরে আসতে পারে নিজ নিজ জন্ম-ভূমিতে।

আচ্ছা, যাযাবর পাখিরা যে এইভাবে সুদূরের পথে যাত্রা করে, তার পিছনে কি কোন প্রকার শারীরবৃত্তীয় উদ্দীপনা কাজ করে? আমরা জানি, যে-কোন কাজই নিয়মিত করলে ক্রমশঃ তৈরি হয় অভ্যাস, আর অভ্যাস থেকেই সৃষ্টি হয় নেশা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দেশ থেকে দেশান্তর গমন এইসব পাখিদের এক ধরনের নেশা, তাহলে বলতে হয়, এর সূত্রপাত হয়েছিল প্রকৃতির প্রতিকূলতা এড়িয়ে অনুকূল পরিবেশ খোঁজার তাগিদে। ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে তা একসময় নেশায় পর্যবসিত হয়েছে। ক্রমে এই নেশা বংশগত হয়ে গেছে। তাই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা রকম শারীরবৃত্তীয় কার্য-কলাপের জটিলতা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, দেশান্তর গমনে প্রেরণা যোগাতে প্রকৃতির ভূমিকা কিছু থাকলেও মুখ্য উদ্দীপনা আসে কিন্তু তার নিজস্ব শারীরবৃত্তীয় কার্য-কলাপের মধ্য থেকেই। খুবই বিস্ময়ের কথা এই যে, চক্রাকারে ঋতু-পরিবর্তনের মতো প্রতিটি যাযাবর পাখির শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপও নিজস্ব ছন্দে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "অন্তর্জাত স্পন্দন" (Endogeneous Rhythm)। ঋতুকালীন ভ্রমণ শুরুর আগে, শারীরবৃত্তীয় প্রস্তুতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরস বা হর্মোন (Hormone)। সময় মত হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নানারকম উদ্দীপক

হর্মোন নিঃসরণ ক'রে সৃষ্টি করে উপযুক্ত শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ। এদেরই প্রভাবে, এইসব পাখির দেহে অতিরিক্ত মেদ জমে, এবং দীর্ঘ যাত্রাপথে এই মেদই শরীরে বাড়তি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। সেই সঙ্গে পিটুইটারি নিঃসৃত যৌন-উদ্দীপক হর্মোন-এর ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ বাড়ে-কমে, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দীপনা যোগায়। সমগ্র শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে অনেকগুলি হর্মোনেরই বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা ঠিক। তবে এই ব্যাপারে কোন্‌টি মুখ্য, আর কোন্‌টি গৌণ, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা আজও সম্ভব হয় নি। এবিষয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আর একটি বিষয় বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে বিশেষভাবে। তার কারণ, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, কাছাকাছি অনুরূপ আবহাওয়াযুক্ত দেশ থাকা সত্ত্বেও যাযাবর পাখিরা হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে, সময় সময় সাগর-মহাসাগরের কিংবা সুউচ্চ পাহাড়-পর্বতের বাধা ডিঙ্গিয়ে, চলে যায় সুদূর প্রবাসে, পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে। *কিসের তাড়নায় প্রতি বছরই তারা এইভাবে ছুটে যায় দূর বিদেশে?*

ভেগেনার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, সুদূর অতীতে সমগ্র স্থলভাগ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মাত্র মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে তারা একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে সরে গেছে, দূর থেকে ক্রমশঃ আরও দূরে। এজন্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক-এক জাতের পাখি,

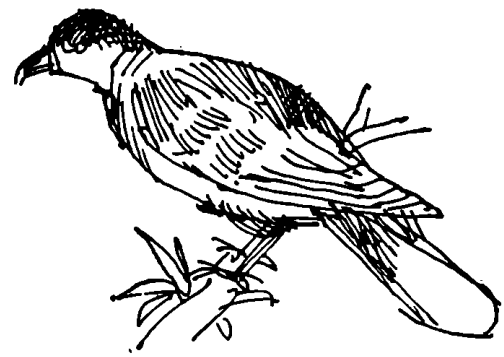

আহারের সন্ধানে, অতীতে যে-সব দেশ পরস্পরের সংলগ্ন অথবা খুব কাছাকাছি ছিল, সেইসব দেশেই যেতে ভালবাসত, এবং প্রতিবছরই সেখানে যেত। এইভাবে তাদের মধ্যে হয়তো একটা জন্মগত প্রবৃত্তি (Natural insti ct) গড়ে উঠেছিল। কোটি কোটি বছর ধরে এইসব দেশের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। কিন্তু ঐসব পাখি বংশপরম্পরায় ঐ প্রবৃত্তিরই দাস হয়ে রয়েছে, তাদের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হয় নি। তাই প্রতি বছরই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রকৃতির নিয়মেই, তারা পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অথবা দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে, দলে দলে ছুটে যায় নির্বাচিত দেশের দিকেই, যদিও অনেকের কাছেই সে দেশ সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা। প্রাণিজগতে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই রহস্যের সঠিক সমাধান খুঁজে বের করা আজও কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি।

৭৭/১ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, ফ্ল্যাট ২, কলি-৩৭

● বিজ্ঞান সংবাদ

"বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ" উপলক্ষে 'চক্ষুদান অনুষ্ঠান'

১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার তাহেরপুর বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক চক্ষু ব্যাঙ্ক-এর (International Eye Bank) সহায়তায় এক "চক্ষুদান শিবির" উদ্বোধন হয় এবং এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যসহ ১২৫ ব্যক্তি মৃত্যুর পর তাঁদের চক্ষুদান-এ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপদেষ্টা কমিটির সভ্য শ্রীসুধাংশু দাস। তিনি চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিষদের অন্যান্য বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আন্তর্জাতিক চক্ষু-ব্যাঙ্কের সহায়তায় তাহেরপুর বিজ্ঞান পরিষদে একটি চক্ষুব্যাঙ্কের শাখা খোলা হচ্ছে।

পরিবেশের উন্নতিতে সায়েন্স ক্লাব

গত ২৬শে এপ্রিল ১৯৮১ দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল, সায়েন্স ক্লাব যাদবপুর, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর একস্ট্রা কারিকুলার সায়েণ্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস্-এর উদ্যোগে গান্ধী স্ট্যাডি সেণ্টারে আয়োজিত 'পরিবেশের উন্নতি সাধনে বিভিন্ন সায়েন্স ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা' শীর্ষক একদিনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ডঃ মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সায়েন্স ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্যে আবেদন জানান।

বক্তাদের মধ্যে ডঃ দিলীপকুমার সিংহ, ডঃ সরোজ ঘোষ, শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীঅজয় হোম ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্যবৃষ্টি

হীরক দাশ

'মৎস্য-বৃষ্টি' কথাটি তোমরা অনেকেই শুনেছো। বৃষ্টির সময় আকাশ থেকে মরা কিম্বা টাটকা মাছ পড়ে। তবে তোমরা এ ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখো নি। আর দেখবেই বা কি করে কারণ এই মৎস্য-বৃষ্টি তো খুবই বিরল ঘটনা।

মৎস্য-বৃষ্টির কথা সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বলেছিল এথেনীয়রা, আজ থেকে প্রায় দ' হাজার বছর আগে। তারপর থেকে নানান শিল্প-নিদর্শন, পুরোন পুঁথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই মৎস্য-বৃষ্টির খোঁজখবর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ১৯৭২ সালে বিহারের একটি ছোট্ট গ্রামে এই মৎস্য-বৃষ্টি হয়েছিল। আর সবচাইতে বেশি মৎস্য-বৃষ্টি হয় সিঙ্গাপুরে ১৮৬১ খৃস্টাব্দে। হাজার হাজার বরফের মতো ঠাণ্ডা মাছ রাস্তায়, মাঠে ঘাটে, বাড়ীর ছাদে, আনাচে-কানাচে প্রায় পঞ্চাশ একর জমির উপর পড়েছিল। কিন্তু এই মৎস্য-বৃষ্টি কি ভাবে ঘটে তা জানতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে জলস্তম্ভের কথা।

জলের মধ্যে দিয়ে যদি দুটো স্রোত পাশাপাশি দুদিকে চলতে থাকে তাহলে দুটো উল্টো টানের মাঝে পড়ে একটি ঘূর্ণিপাকের সৃচনা হয় এবং জল ঘোরার ফলে ঘূর্ণিপাকের ঠিক মাঝখানে একটি ফাঁপা গর্তের সৃষ্টি হয়, এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে যা কিছু এসে পড়ে তা সবই ঘুরতে ঘুরতে ঐ ফাঁপা গর্তে গিয়ে ঢোকে। ঠিক এভাবেই বাতাসেও ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়। দুটো বাতাসের স্রোত পাশাপাশি দু'মুখো চললে ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয় এবং এর মাঝখানেও তৈরি হয় সেই ফাঁপা গর্ত। আমরা যদি বাতাসের এই ঘূর্ণিটাকে দেখতে পেতাম তাহলে এটিকে আকাশে উল্টোভাবে ঝুলে থাকা এক লম্বা চুড়োওয়ালা টুপির মতোই দেখতাম। এভাবেই ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় বাতাসে মেঘের জলকণা এই ঘূর্ণির ফাপা গর্ত বা থলের মধ্যে জমতে আরম্ভ করে। তখন দেখলে মনে হয় যেন একটা বিরাট চুড়োওয়ালা কালো টুপি উল্টোভাবে আকাশে ঝুলে রয়েছে এবং ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে। জলভরা এই মেঘ আকাশে বাতাস-টুপির মধ্যে ঝুলতে থাকে কিন্তু ঐ জল বৃষ্টি হয়ে নিচে পড়ে না। সাধারণত বড় বড় নদী কিংবা সমুদ্রের উপরই এরকম হয়ে থাকে। তখন কেবল যে উপরের বাতাসে জল-ভরা কালো মেঘ ওরকমভাবে নিচে নামতে থাকে তা নয়, নিচের সমুদ্রের জলও ঘুরতে ঘুরতে চুড়োর মতো উঁচু হয়ে উপরদিকে উঠতে আরম্ভ করে। তারপর যখন এই দু'এর মিলন হয় তখনই বড় থামের মতো জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। যা দেখে মনে হয় যেন সমুদ্র থেকে একটা মোটা জলের থাম ঘুরতে ঘুরতে উপর দিকে ছুটে চলছে।

এই সময় প্রচুর সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী এবং আগাছা এই স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সোজা উপরে উঠে গিয়ে মেঘের রাজ্যে চলে যায়।

এরপর আসে আসল বিপদ। অল্প কিছুক্ষণ পরই এই দু'এর সংযোগ ছিন্ন হয়, তখন অতো উপর থেকে হাজার হাজার টন জল সমুদ্রের বুকে প্রচণ্ড শব্দ করে আছড়ে পড়ে। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। নিচে কোন জাহাজ থাকলে তা একেবারে গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে।

যাই হোক, সামুদ্রিক মাছ এবং অন্যান্য ছোট প্রাণী এইভাবেই মেঘের মধ্যে চলে যায়। তারপর সেই মেঘ আশেপাশের কোন রাজ্যে উড়ে গিয়ে যখন সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করে তখন সেই বৃষ্টির সাথে ঠাণ্ডা মাছ ইত্যাদি মাটিতে পড়তে আরম্ভ করে। এই বৃষ্টিকেই তখন বলা হয় মৎস্য-বৃষ্টি।

১৯ / আর সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৩১

গত সংখ্যার ভেবে বল'র উত্তর

(১) এক রকম দ্রুতগতিসম্পন্ন বাতাস।
(২) এক প্রকার গাছের ছাল থেকে নির্গত তরল পদার্থ থেকে তৈরী হয়—যার নাম LATEX।
(৩) সরীসৃপ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। 2500 রকমের।
(৪) 2000 টন।
(৫) প্রশান্ত মহাসাগর (14,048 feet) গভীর।
(৬) 1830 সালে বার্থেমী থিমোসিয়ার।
(৭) এক ধরনের মাছ। ঘোড়ার মত মুখ, গায়ে আঁশ থাকে ও সাপের মত লেজ।
(৮) ভারতীয় গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্।
(৯) এক ধরনের গুল্মজাতীয় গাছ।
(১০) INDIAN NATIONAL SATELLITE
(১১) SPECTROSCOPE
(১২) 1200° সে.

নিজে কর ঃ ইণ্টারকম্

চন্দন ঘোষ

'ইণ্টারকম্' ব্যাপারটা তোমরা সকলে জানো নিশ্চয়ই। একদিন বাবার অফিসে বেড়াতে গিয়ে সেখানে ইণ্টারকম্ দেখে তোমাদের বন্ধু বুবু আর মণ্টুর খুব ইচ্ছে হল তারা একটা ইণ্টারকম্ বানাবে। তাই তারা সোজা চলে গেল শমীকদার বাড়ীতে। বুবু প্রথমেই শমীকদাকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা শমীকদা আমরা কি বাড়ীতে খুব সহজে একটা ইণ্টারকম্ সেট বানাতে পারি না? যাতে আমরা বাড়ীতে একতলার ঘরে বসেই তিনতলার সাথে কথাবার্তা বলতে পারি।

শমীকদা গম্ভীরভাবে বললেন ইণ্টারকম্ বানানো খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। মণ্টু একতলায় বসে গান গাইলে বুবু তিনতলার ঘরে বসে ঐ গান খুব সহজেই ইণ্টারকমের মাধ্যমে শুনতে পাবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা জটিল মনে হলেও, তোমরা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে একটা সাধারণ ট্রানজিস্টার রেডিও থেকেই মোটামুটি ভাবে কাজ চালানোর মত ইণ্টারকম সেট বানাতে পারো। কি কি লাগবে সেটা আমাদের প্রথমে জানা দরকার।

(১) একটা ট্রানজিস্টার রেডিও (এটা নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ীতে আছে)

(২) একটা স্পীকার (Speaker)

(৩) দুটো D. P. D. T সুইচ (দু-ব্যাণ্ড পকেট ট্রানজিস্টার রেডিওতে যে ব্যাণ্ড্ সুইচ্ ব্যবহার করা হয়)

প্রথমে রেডিওর পিছনদিকের কভারটা খুলে Volume control সুইচ্টা ভালো করে লক্ষ্য কর। লক্ষ্য করলে দেখবে যে Volume control সুইচে তিনটে কানেক্শান পয়েণ্ট আছে। এবার যে স্পীকারটা কিনে এনেছ তার দুই প্রান্তে দুটো লম্বা তার লাগাও। একটা তারের অপরপ্রান্ত Volume control-এর দ্বিতীয় পয়েণ্টে যোগ কর। অন্য তারটা রেডিওর চেসিস্ অর্থাৎ নেগেটিভ পয়েণ্টে যোগ কর।

এবার রেডিওর সুইচটা অন্ করে ঐ স্পীকারে (S_2) মণ্টু যদি কথা বলে তাহলে রেডিওর নিজস্ব স্পীকারে (S_1) সেটা শোনা যাবে।

মণ্টু অমনি জিজ্ঞেস করে বসল—শমীকদা, এখানেই কি তাহলে কাজ শেষ?

শমীকদা মুচকি হেসে বললেন—এখনো কিছুটা বাকি আছে। আমরা জানি, ইণ্টারকমে দু'দিক থেকে কথা বলা আর শোনা দুই-ই করা যায়। এই অবস্থায় কিন্তু রেডিওর নিজস্ব স্পীকারে (S_1) কথা বললে সেটা অন্য স্পীকারে (S_2) শোনা যাবে না। সেজন্যে, এটাকে ইণ্টারকমের মতো ব্যবহার করতে হলে আমাদের দুটো D.P.D.T. সুইচের প্রয়োজন।

একটু আগে যে তার দুটো দিয়ে স্পীকার S_2কে রেডিও সেটের সাথে যোগ করেছিলে সেই তার দুটো এখন খুলে ফেল। এখন ১ নম্বর ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে তারগুলো যোগ কর। অর্থাৎ একটা D P.D.T. সুইচের ৩ ও ৪ নম্বর পয়েণ্ট স্পীকার S_2-র দুটো তারের সঙ্গে এবং ১ নম্বর পয়েণ্ট Vol. control-এর মধ্য পয়েণ্টে আর ২ নম্বর পয়েণ্ট চেসিসে যোগ করা হল (চিত্র—১, ২)

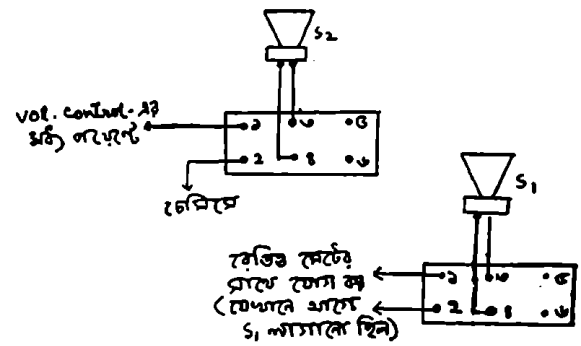

ছবি ১. ২

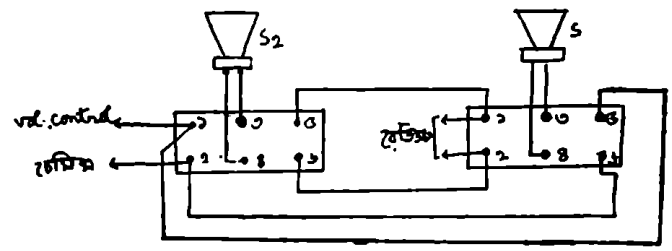

ছবি ৩

এবার আর একটা D.P.D.T. সুইচ ২ নম্বর ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে যোগ কর। প্রথমে স্পীকার S_1-এর দুটো পয়েণ্ট থেকে তার খুলে নিয়ে সেখানে দুটো নতুন তার যোগ কর। এবার ঐ তার দুটো সুইচের ৩ ও ৪ নম্বর পয়েণ্টে যোগ কর। ১ ও ২

নম্বর পয়েন্ট রেডিওর দুটো তারের সঙ্গে (যেখানে আগে S_1 লাগানো ছিল) যোগ করে দেওয়া হল।

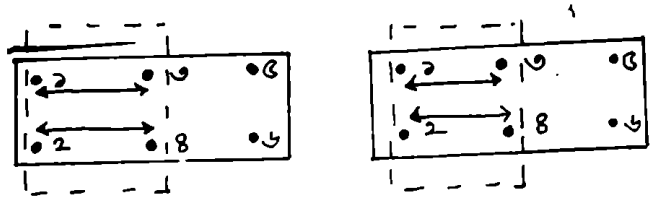

ছবি ৪

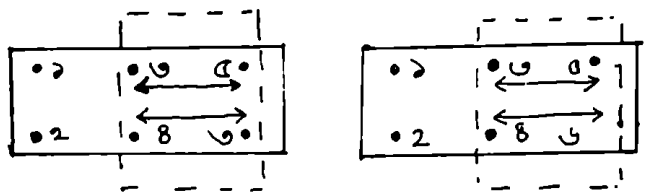

ছবি ৫

এবার প্রথম সুইচের ৫ ও ৬ নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয় সুইচের যথাক্রমে ১ ও ২ নম্বর পয়েন্টের সাথে এবং দ্বিতীয় সুইচের ৫ ও ৬ নম্বর পয়েন্ট প্রথম সুইচের যথাক্রমে ১ ও ২ নম্বর পয়েন্টের সাথে যোগ করা হল (চিত্র—৩)। 'ইন্টারকম' তৈরীর কাজ এখন মোটামুটি শেষ।

প্রথমে রেডিওর সুইচটা অন্ করে কোন স্টেশন না ধরা অবস্থায় রাখো। এবার প্রথম সুইচটাকে বাম দিকে সরিয়ে রেখে S_2 স্পীকারে কথা বললে সেটা S_1 স্পীকারে শোনা যাবে। দ্বিতীয় সুইচটাকেও এই অবস্থায় অবশ্যই বামদিকে সরিয়ে রাখতে হবে (চিত্র—৪)।

এখন যদি S_1 স্পীকারে কথা বলে S_2 স্পীকারে শুনতে হয়, তাহলে দুটো সুইচকেই একদম উল্টোদিকে অর্থাৎ ডানদিকে সরাতে হবে (চিত্র—৫)

তাহলে বুঝতেই পারছো, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক শক্ত জিনিস আমরা কত সহজে করতে পারি। আমার ছোট্ট ভাইবোনেরা, তোমরাও বুবু মন্টুর সঙ্গে এই কাজে লেগে পড়ে দেখো না—তোমরাও তোমাদের বাড়ীতে এই 'ইন্টারকম সেট্' বানাতে পারো কিনা ?

পি ৩৫।১ বোসপাড়া রোড, বড়িষা, কলিকাতা-৮

চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্মরণীয় যাঁরা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার জন্যে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের জেনে রাখো ঃ

মার্টিনাস ভিলেম বিজারনিক। জন্ম ১৮৫১ ডেনমার্কে, মৃত্যু ১৯৩১। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু আছে তিনি তা আবিষ্কার করেন। যার নাম 'ভাইরাস'। 'ভাইরাস' এই শব্দটি তাঁরই চয়ন করা।

হানস বার্গার। জন্ম ১৮৭৩, জার্মানিতে ; মৃত্যু ১৯৪১। প্রখ্যাত মস্তিষ্কবিষয়ক বিজ্ঞানী (নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট)। ১৯২৯ সালে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ মাপার জন্যে তিনিই প্রথম ইলেকট্রো এনসিফেলোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

অ্যালবার্ট সি. টি. বিলরথ। জন্ম ১৮২৯ জার্মানিতে : মৃত্যু ১৮৯৪। প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক। ব্যাকটেরিয়া যে শরীরের ক্ষত দূষিত করে সে ঘটনা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। জন্ম ১৮২১, মৃত্যু ১৯১০। তিনিই প্রথম মার্কিন মহিলা যিনি নিউইয়র্কে মহিলাদের জন্যে প্রথম মেডিকেল কলেজ তৈরী করেন (১৮৫৭)।

অ্যালফ্রেড ব্লালক। জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৬৪। মার্কিন শল্য চিকিৎসক। ১৯৪৪ সালে হেলেন টাউসিগ নামক একজন সহকারীর সাহায্যে তিনি প্রথম 'ব্লু বেবি'র (জন্মসূত্রে বিকলাঙ্গ হৃদপিণ্ডের দরুন এই শিশুদের শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় না ; তাই শরীরের রঙ নীলচে মনে হয়) হৃদ্‌পিণ্ডে বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

কনরাড এমিল ব্লক। জন্ম ১৯১২, জার্মানিতে। এখন মার্কিন নাগরিক। প্রখ্যাত জীব-রাসায়নিক। জীবিত-কোষ কীভাবে কোলেস্টারল তৈরি করে, তিনি তা আবিষ্কার করেন। এই কাজের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। রক্তে কোলেস্টারল বাড়লে রক্তচাপ হয়।

[আগামী সংখ্যায় আরও আছে]

মাটি থেকে আকাশে স্বপ্ন হ'লো সত্যি (২)

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পৃথিবীর আকাশে ডানা মেলে সর্বপ্রথম উড়েছিল কীট-পতঙ্গেরা। সেও আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগের কথা। সরীসৃপরা উড়তে পেরেছিল আট কোটি বছর আগে। প্রথম স্তন্যপায়ী যে প্রাণী আকাশে উড়েছিল সে হচ্ছে বাদুড়।

সরীসৃপ থেকে পাখির জন্ম হল। এখন যে সব পাখি আমাদের চোখে পড়ে তারা পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সত্তর লক্ষ বছর আগে থেকে।

কীট পতঙ্গই পৃথিবীর আকাশে প্রথম উড়েছিল আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে। তার পরে উড়েছে সরীসৃপ, আট কোটি বছর আগে। প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী বাদুড় উড়তে শিখেছে তিন কোটি বছর আগে।

যখন ক্রীট দ্বীপে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ডানা মেলে উড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

নানারকম পাখি কেমন করে আকাশে ডানা মেলে ওড়ে।

পাখিকে নীল আকাশের বুকে মনের সুখে ভেসে বেড়াতে দেখে মানুষের খুব হিংসে হোত। সেও চাইত আকাশে উড়তে। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী এবং উপকথায় মানুষের এই গোপন ইচ্ছার কথা জানা যায়। মিশরের দেবী আইসিস তাঁর ভক্তদের ডানার নীচেয় রেখে রক্ষা করতেন। প্রাচীন কালের লেখা ও ছবিতে দেখা যায় খৃস্টান দেবদূতেরা ডানা মেলে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসছেন। ভারতীয়, চীনা এবং স্কানডিনেভিয়ান উপ-কথাতেও অনুরূপ মূর্তি দেখা যায়।

গ্রীক পুরাণ অনুসারে জানা যায় এথেন্সের বিজ্ঞানী ডাডিলাস একসময় আকাশে উড়তে পেরেছিলেন। তিনি

গ্রীক পুরানের ডাডিলাস তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন আকাশে উড়ে।

মোনালিসার বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি কেবলমাত্র শিল্পীই ছিলেন না। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি পাখিরা কিভাবে আকাশে ওড়ে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন অনেক। ১৪৯০ খৃস্টাব্দে লিওনার্ডো মন্তব্য করলেন (যদিও সেটা ঠিক নয়)—পাখিরা ডানা ঝাপটানোর ফলেই আকাশে উড়তে পারে। লিওনার্ডোর আঁকা অর্নিথপটারের দুটো মডেল ছবিতে দেখানো হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বারনৌলি একটি ছোট্ট ঘটনা আবিষ্কার করেন। যখন কোনও বাতাস খুব দ্রুত প্রবাহিত হয় তখন তার চাপ কমে যায়। পাখিরা আকাশে উড়বার সময় তার ডানার নীচের তলের চাইতে উপরের তল দিয়ে বাতাস খুব জোরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ডানার দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের তলের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক কমে যায়। তখন ডানার নীচের বাতাসের চাপ বেশি থাকায় পাখি খুব সহজেই আকাশে ভেসে থাকতে পারে।

স্যার জর্জ ক্যালেকে বলা হয়—ফাদার অব্ দা এরোনটিক্স। পাখিরা ঠিক কি ভাবে আকাশে ওড়ে এ নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। জর্জ ক্যালে প্রমাণ করলেন—বাতাসে ভর দিয়েই পাখি আকাশে উড়তে পারে, ডানা ঝাপটিয়ে নয়।

ফরাসী ভদ্রলোক ক্লিমেন্ট এডারই প্রথম বাদুড়ের মতো দেখতে উড়োজাহাজ বানিয়েছিলেন ১৮০৯ খৃস্টাব্দে। স্টীম চালিত এই উড়োজাহাজটি মাটি থেকে আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছিল জলজ্যান্ত একজন মানুষকে নিয়ে।

অটোলিলিএনথালের কিন্তু উড়োজাহাজের এঞ্জিনের উপর ভরসা ছিল না মোটেই। তিনি যে গ্লাইডারটা তৈরী করেছিলেন সেটা মানুষই চালাতে পারত অঙ্গ-সঞ্চালনের সাহায্যে। তিনি বেশ কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত ১৮৯৬ সালে এক প্রচণ্ড দুর্ঘটনায় তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

এঞ্জিনের সাহায্যে প্রথম আকাশে উড়েছিলেন উইলবার এবং অরভিল রাইট। ১৯০৩ সালের সতেরই ডিসেম্বর তাঁরা নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের উপর প্রায় একমিনিট উড়ে থাকতে পেরেছিলেন।

এরপর লুই ব্লেরিওট তাঁর নিজের ডিজাইনে তৈরী উড়োজাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন। সেটা ১৯০৯ সালের কথা।

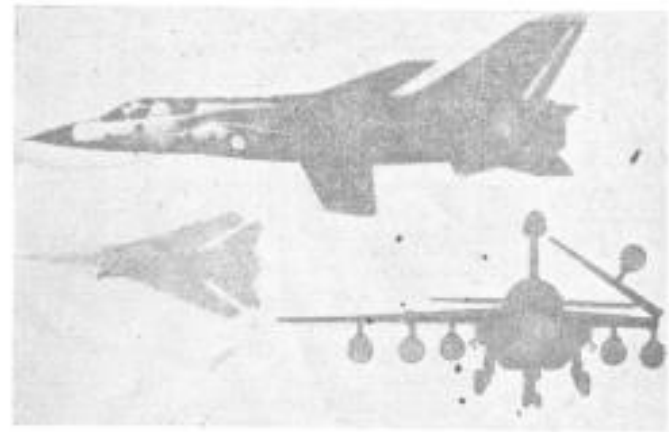

উপরে মিরেজ জি-৮ ফাইটার বিমান যা ঘণ্টায় ১৬৫০ মাইল বেগে উড়তে পারে। নীচে ডানদিকে আমেরিকান গ্রুমান এড এ্যাটাক উড়োজাহাজ। যে বিমান নিজের খুশীমতো ডানা মেলতে পারে এবং গুটাতে পারে।

বোমারু বিমান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্টল বিমান স্পিট ফায়ার, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ্যাব্রো বম্বার।

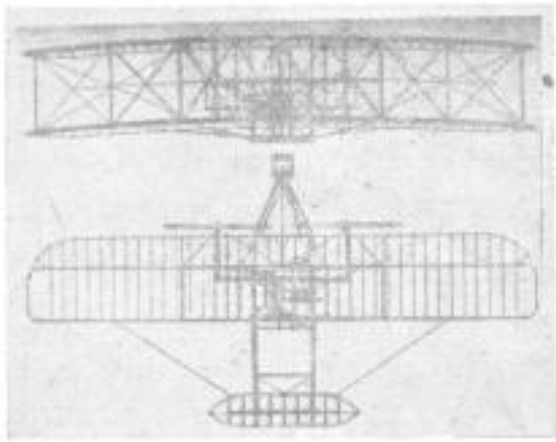

রাইট ভাইদের তৈরী উড়ো জাহাজ ১৯০৩

অটোলিলিএনথালের তৈরী উড়োজাহাজ

কমার্সিয়াল এরোপ্লেন প্রথম তৈরী করেছিলেন ফ্রান্সে ভয়াসিন ব্রাদার্স এবং ইংল্যাণ্ডে সর্ট ব্রাদার্স। দ্য মনোকোক ডেপার ডুসিনই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম দ্রুতগামী বিমান যা নাকি ঘণ্টায় ১২৪ মাইল বেগে উড়তে পেরেছিল।

তারপর এল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। কারখানায় দিনরাত তৈরী হতে লাগল নানাধরনের ফাইটার ও বম্বার বিমান। বিমানের নতুন নতুন মডেলও তৈরী হ'ল অনেক। সত্যি কথা বলতে কি পর পর দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলেই উড়োজাহাজের ডিজাইনের ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। জেট এঞ্জিনও এই সময়েই তৈরী হয়েছিল। এই এঞ্জিনের ভিতরের কাজকর্মের ব্যাপারটিও অতি সাধারণ। এঞ্জিনের পিছন থেকে গরম গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে উড়োজাহাজকে সামনের দিকে ঠেলে দিত। তৈরী হ'ল সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে—মিরেজ বিমান, যা নাকি ঘণ্টায় ১,৬৫০ মাইল বেগে ছুটতে পারে! আমেরিকার গ্রুমান-এ-সিক্স এ্যাটাক বিমান এল এর পরে। আবার অবাক কাণ্ড করে বসল মানুষ—হেলিকপটার তৈরী করে। হেলিকপটার সোজা উপরে উঠতে পারে, নীচে নামতেও পারে সোজাসুজি, এগুতে, পিছুতে যে দিকে খুশী যেতে পারে। যদিও উদ্ধারকার্যেই হেলিকপটারকে বেশী ব্যবহার করা হয় তবুও যুদ্ধেও এর কেরামতি কিছু কম নয়। হেলিকপটারের মাথার উপরে বিরাট পাখার মতো যে ব্লেডগুলো ঘুরতে থাকে সেগুলিকে উড়োজাহাজের ডানার মতো করে তৈরী করা হয়। এই ব্লেডগুলোর কোণ (এ্যাঙ্গল) পাল্টিয়ে পাইলট হেলিকপটারের গতিকে কমাতে অথবা বাড়াতে উপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে।

কনকর্ডই হচ্ছে সর্বপ্রথম সুপারসোনিক যাত্রীবাহী বিমান। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে এই বিমান চলে।

বিভিন্ন ধরনের হেলিকপটার

আর. এইচ. এস. নিউ আলিপুর (সাহাপুর) ব্লক-এন
ফ্ল্যাট ৭, কলিকাতা-৭০০০৩৮

বেবুন

হলদে বেবুন, গিলেডা বেবুন, চাকমা বেবুন, ম্যানড্রিল, ডিল।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বেবুনদের (baboon) প্রধান আড্ডা আফ্রিকা। এরা বাঁদরদেরই একরকম নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু আকারে বাঁদরদের চাইতেও অনেক বড়। এদের শরীরের বাঁধন খুব দৃঢ় এবং শক্তিও খুব। খুব সাহসী মানুষেরাও এদের

হলদে বেবুন

কাছে ঘেঁসতে ভয় পায়। বেবুনের মুখ দেখতে অনেকটা কুকুরের মুখের মতো লম্বা। সেইজন্য এদের কুকুর-মুখো বাঁদরও বলা যায়। এদের শরীরে, মাথায়, গলায়, হাতে ও পায়ে লোম জন্মে। সাধারণ বাঁদরের মতো এদেরও মুখের ভিতর থলি থাকে।

বেবুনরা গাছে চড়ে ডালে ডালে বিশেষ লাফালাফি করতে পারে না। সেইজন্য এরা দল বেঁধে মাটিতেই বিচরণ করে। এক এক দলে কখনো কখনো প্রায় ৩০০ পর্যন্ত বেবুন দেখতে পাওয়া যায়। আবার ৮/১০টাতে মিলে ছোট ছোট দলেও ঘুরে বেড়ায়। দলের সর্দার হয় কোন একটা পুরুষ বেবুন। তার আদেশ ও নির্দেশ মতোই অন্যান্য বেবুনরা চলে। সর্দারের আদেশ লঙ্ঘন করার সাহস কোন বেবুনেরই নেই।

বেবুনের স্বভাব খুব হিংস্র। একবার ক্ষেপে গেলে মানুষ ত দূরের কথা বাঘ-সিংহরাও রেহাই পায় না। আফ্রিকায় তো ডোরাদার বাঘ নেই, কিন্তু গুলবাঘ আছে। বেবুনের ছানার মাংস তাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। বাঘের মুখ থেকে ছানাগুলো বাঁচাবার জন্য এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহারা দেয়। একটু উঁচু জায়গা থেকে এরা শত্রুর খোঁজ-খবর নেয়। বিপদ উপস্থিত হলে মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করে। আর তখুনি গোটা দলটা ছুটে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ বিপদে পড়ে গেলে বেবুনরাও সহজে ছাড়ে না। পাঁচ সাতজন মিলে আঁচড়ে কামড়ে বাঘের দফা রফা করে ফেলে। বেবুনরা ফলমূল খেতে ভালোবাসে। ফলমূলের অভাবে এরা পোকামাকড় টিকটিকি গিরগিটিও খায়। পাখির ডিম কাঁকড়াবিছেও এদের প্রিয় খাদ্য। মাঝে মাঝে এরা দল বেঁধে বাগানে ঢুকে বাগান তছনছ করে ফেলে। তাড়া করলে না পালিয়ে বরং দাঁত মুখ ভেংচে কামড়াতে আসে।

দলবদ্ধভাবে লুটপাট করতে যাওয়ার আগে এরা চর পাঠিয়ে খোঁজখবর নেয়, এমন কি লুটপাটের সময়ও চারিদিকে পাহারা রাখে, এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সংগে লুটপাটের কাজ হাসিল করে। তবে বিপদের ইংগিত পেলে এরা ভুলেও ফলের বাগানে প্রবেশ করে না।

আফ্রিকাতে সাত আট রকমের বেবুন আছে। কোন কোন বেবুনের সামনের পায়ের তলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত প্রায় দু'হাত উঁচু হয়। আফ্রিকাতেই একরকম 'হলদে বেবুন' আছে প্রায় তিন হাত লম্বা। আবিসিনিয়াতে

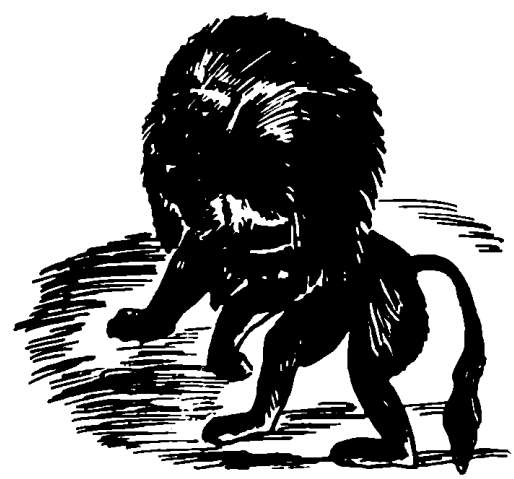

গিলেডা বেবুন

'গিলেডা' নামে একপ্রকার বেবুন দেখতে পাওয়া যায়, যাদের পিঠ, গলা ও মাথার দুধারে কেশরের মতো লম্বা

লোম জন্মে, এবং লেজের দিকেও একগোছা চুল থাকে। এদের উচ্চতাও প্রায় তিন হাত। আরব দেশেও গিলেডা বেবুন দেখতে পাওয়া যায়।

'চাকমা বেবুন' দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। বেবুন জাতির মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়। দেখতে অনেকটা গিলেডা বেবুনের মতো। তবে এদের ঘাড়ে কেশরও হয় না.লেজের ডগায় লোমও হয় না। চাকমা বেবুনের গায়ের রং কালো হলেও সবুজের আভা থাকে। হাত-পা ও মাথা ঘোর কালো। মুখের রং লাল. চোখের চারপাশ সাদা।

চাকমা বেবুন

এরা দুর্গম পাহাড় পর্বতের মধ্যে বাস করে। কাউকে আক্রমণ করার দরকার হলে এরা দল বেঁধেই এগিয়ে যায়।

ম্যানড্রিল

আফরিকার পশ্চিমদিকে একরকম বেবুন বাস করে। তাদের বলে 'ম্যানড্রিল'। ম্যানড্রিল দেখতে খুব কুৎসিৎ। এবং এদের স্বভাব খুব হিংস্র। এদের মাথায় সরুসরু লম্বা লোম জন্মায়। নাকের দুপাশ বেজায় ফোলা. আবার সেই ফোলা অংশে লাল ও নীল ডোরা ডোরা। ম্যানড্রিল শূয়রের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। স্বাধীন অবস্থায় তো দূরের কথা. বন্দী অবস্থাতেও এদের কাছে কেউ ঘেঁসতে সাহস পায় না।

আফ্রিকার 'ড্রিল' বেবুনও দেখতে অনেকটা ম্যানড্রিলেরই মতো। এরা একই গোষ্ঠীর প্রাণী। এদেরও নাকের দুপাশ ফোলা, তবে ম্যানড্রিলের মতো অতো বেশী নয়। ড্রিলের মুখের রং গাঢ় নীল। এরাও বেজায় দুর্দান্ত।

শোনা যায়. এইসব বড় বড় বেবুনদের মধ্যে যখন লড়াই লাগে তখন খুনোখুনি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়। হৈ হল্লার চোটে কানে তালা ধরে যায়। বড় বড় গাছ পাথরও ছোঁড়াছুড়ি চলে। একপক্ষ না হারলে নাকি এই যুদ্ধ থামে না।

অবশ্য এসবকথা কতদূর সত্যি বলা কঠিন।

গ্রন্থকারের 'পশুপক্ষী' হইতে পুনর্লিখিত।

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজ্ঞান আজ কত অজানাকে তোমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। দেশী বিদেশী পত্রিকা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন মারফৎ কত নতুন নতুন রহস্যের উদ্‌ঘাটন হচ্ছে তোমাদের জীবনে। নিত্যনূতন।

কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগেও বিজ্ঞানকে আমরা আমাদের জীবনে কতটুকু প্রয়োগ করছি? বিজ্ঞান তো প্রযুক্তিবিদ্যা? ছোট্ট একটা দৃষ্টান্তই ধর না। এই আমাদের শহর কলকাতা। এখানকার ভয়ঙ্কর ভীড়ের কথা তোমাদের কারো অজানা নয়। তার ওপরে যোগ হয়েছে 'পলিউশন'। নানারকম জ্বালানী কলকাতার বায়ুকে দূষিত করছে অহরহ। এই দূষণের পিছনেও কিন্তু আমাদের অবৈজ্ঞানিক মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়া ও নোংরা যেমন বায়ু ও জল দূষিত করছে, তেমনি যানবাহনগুলির পরিত্যক্ত পোড়া মবিলের ধোঁয়া এই শহরের বায়ুকে করেছে শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জ্বালানী উনুনের ধোঁয়া।

তোমরা সকলেই জান ধোঁয়া মানেই কার্বন। যা আমাদের শরীরের পক্ষে বিষবৎ। এ বিষয়ে ভাববার দিন এসেছে। তবে ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গাছ লাগিয়ে 'পলিউশন'–কে রোধ করার আবেদন অনেক কাল থেকেই তোমাদের কাছে আমরা জানিয়ে আসছি। কারণ তোমরা জান যে গাছপালা কার্বন ডায়োকসাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। এছাড়া গাছের জন্য আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে ও বৃষ্টি বাদলও হয়। গাছ মাটির অবক্ষয় দূর করে ও জমির আর্দ্রতা রক্ষা করে।

তোমরা কি ভাবছো এ বিষয়ে?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত)

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHOR JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।

নিয়মাবলী

- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শারদসঙ্কলন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
পুরস্কৃত

পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১

পরিচালনায় : দি সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

SAB

· প্রশংসা পত্র ·

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দি সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত ও কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সহকারে বিজ্ঞান পত্রিকা "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" প্রকাশে সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও বিজ্ঞান প্রসারে মানসিকতার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মাননীয় শ্রী রবীন বল মহাশয়কে এই সম্মাননমূলক প্রশংসাপত্র অর্পিত হইল ॥

চিত্রত মজুমদার
চেয়ারম্যান
পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির-৮১
ও
মন্ত্রী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা।